স্বপ্নশর্বরী

আশাপূর্ণা দেবী



গুপ্ত প্রকাশিকা

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
আশ্বিন ১৩৬৩
মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট-শিল্পী ঃ
শ্রীকানাই পাল
ব্লক ও মুদ্রণ ঃ
রিপ্রোডাকৃসন সিণ্ডিকেট
কলিকাতা-৬
প্রকাশক ঃ
বাসন্তী দাশগুপ্তা
গুপ্ত প্রকাশিকা
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মূল্য ঃ
তিন টাকা

শিল্পী   শ্রীমান সুনীলমাধব সেনগুপ্ত

স্নেহভাজনেষু

আশাদি

এই লেখিকার ঃ

অগ্নি-পরীক্ষা
বলয় গ্রাস
নির্জন পৃথিবী
আংশিক
শ্রেষ্ঠ গল্প
নবজন্ম
কল্যাণী
সাগর শুকায়ে যায়
দুর্নীবার
প্রেম ও প্রয়োজন
মিত্তির বাড়ি

দুপুর রোদে

ছুটির দরখাস্তখানা বড়সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বাড়ি আসিয়া সুটকেস গুছাইতে বসিলাম।

বেণু লিখিয়াছে—'বিয়ে-টিয়ে করবার মতলব আছে কি নেই সোজাসুজি খুলে বলো দিকিন, না থাকে বয়ে গেল। মনে কোরো না, অভিমানে মূর্চ্ছা যাবো। আশে পাশে এখনও এমন অনেক অ্যাড্‌মায়ারার আছে যে, শ্রীমতী বেণুর কৃপাকটাক্ষ পেলে ধন্য হয়ে যায়।

'সময় থাকতে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে হবে তো আমাকে? মোটকথা বুড়ি আইবুড়ি হয়ে থাকবার বাসনা আমার নেই। তুমি ওখানে বসে বসে গ্রেড্‌ বাড়াবার জন্যে জীবনপাত করতে থাকবে —আর আমি এখানে শুকনো পুঁথির পাতা নিয়ে রিসার্চ করতে করতে জীবন মাটি করবো এর কোনো মানে হয়?'

এমন চিঠির পর স্থির থাকা শক্ত।

লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বেণুর অভিমান-স্ফুরিত মুখখানি যেন ঝিলিক মারিয়া উঠিতেছে।

একথা মিথ্যা নয়—ছুটি পাইলেই কলিকাতায় ছুটি বেণুর খাতিরেই, ফিরিয়া আসিবার সময় সাধু ভাষায় যাহাকে বিরহ যন্ত্রণা বলে সেটাও দস্তুরমত টের পাই, কিন্তু বিবাহ করিবার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা যেন কিছুতেই মিলিয়া ওঠে না।

সত্য কথা গোপন না করিলে—সাহসেরও অভাব।

বারে বারে হিসাব করিয়াও আশঙ্কা আর কাটিতে চায় না। বেশ ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা—প্রেম করিবার দুঃসাহস না থাক, বিবাহ করিবার সৎসাহস তাঁহাদের ছিল। এবং সেই চির-জীবনের জীবন-সঙ্গিনীকে চাক্ষুষ দেখিয়া লইবারও প্রয়োজন বোধ করিতেন না। উত্তর পুরুষদের চাইতে বুকের পাটা যে তাঁহাদের বহুল পরিমাণে ছিল—সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু না—সাহস সঞ্চয় করিতেই হইবে—এমন স্পষ্ট দাবীকে অগ্রাহ্য করিব কোন্ সাহসে?

অন্য অন্য বারে অবশ্য সোজা বেণুদের বাড়ি গিয়াই হানা দিই, কিন্তু এবারে স্থির করিলাম অন্যত্র উঠিব। হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা কথা বাঙলা ভাষায় চলিত আছে তো।

অগত্যা পিসিমার বাড়ি।

ছেলেবেলায় পিসিমার বাড়িটাই একরকম ঘরবাড়ি ছিল, এখন আর যাওয়া আসা তেমন নাই—নাই একরকম নিজেরই দোষে। হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি প্রবোধদা'র অফিস, কলিকাতায় যাইতে আসিতে ওই অফিস হইতেই তত্ত্বার্তাটা সারিয়া লই।

আজও স্টেশনে নামিয়া ভাবিলাম—অফিসটা ঘুরিয়া যাই, অনেকদিন খোঁজ খবর জানা নাই। খানিকটা যাইতেই দেখি পরেশবাবু টিফিন করিতে বাহির হইয়াছেন, প্রবোধদা'র এক টেবলেই বসেন—মুখ-চেনা ছিল। ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম—একা যে? প্রবোধদা' বেরোন নি?

পরেশবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—কে, সোমেনবাবু নাকি?

আপনার প্রবোধদা' তো আসছেন না—ছুটিতে রয়েছেন যে, আমারই হয়েছে মৃত্যু। সায়েব ব্যাটা হচ্ছে—তেমনি রগচটা, একটু উনিশবিশ হলেই সর্বনাশ, আমি মশাই একা ক'দিক সামলাই?

দাঁড়াইয়া শুনিলে যে পরেশবাবু টিফিন খাওয়া ভুলিয়া সায়েবের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সুরু করিয়া সপিণ্ডকরণ পর্যন্ত সারিবেন এ অভিজ্ঞতা কিছু কিছু ছিল, কাজেই ব্যস্ততার ভান করিয়া বলি —তাই তো, বিশেষ দরকার ছিল তাঁর সঙ্গে, বাড়িতেই যেতে হচ্ছে তবে। —কিন্তু ছুটিতে কেন বলুন তো, অসুখ বিসুখ নাকি?

—না মশাই অসুখ বিসুখ নয়, বছরে টু উইক্‌স্ করে ছুটি পাওনা হয় আমাদের, তা সে ভদ্রলোক যদি জন্মেও নেবেন? এর জন্যে আমরা কত সময় 'ইয়ে' করেছি ওঁকে, এবারে বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে কি মন হ'ল নিয়ে ফেললেন ছুটিটা। তা বাইরে কোথাও যান নি, বোধ হয়, বাড়িতেই পাবেন, যান।

কিন্তু বাড়িতে পাইলাম না।

দুপুর রৌদ্রে—গলদঘর্ম অবস্থায় মোটঘাট সমেত আমার এরকম নাটকীয় আবির্ভাবে যতটা না বিস্মিত হইলেন বৌদি, তার চতুর্গুণ হইলেন প্রবোধদা'র ছুটির খবরে।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন —কি যে বল সোমেন, কার অফিসে যেতে কার অফিসে উঠেছিলে হয়তো। ছুটি নেবেন তোমার দাদা? তা হলেই হয়েছে। যেমন চমৎকার অফিস —বৌ মরে গেলে ছুটি দেয় না ওরা।

কিন্তু আমি-ই বা বিশ্বাস করিব কেন? প্রবল আপত্তি তুলি —আমায় কি পাগল পেলেন? প্রবোধদা'র অফিস ভুলে যাবো? সেদিনও এসেছিলাম,....আচ্ছা পরেশবাবুর নাম শুনেছেন?

—খুব। এক টেবলেই কাজ করে যে —

—তবে? ভদ্রলোক নিজে বললেন—প্রবোধদা' দু'সপ্তাহ ছুটিতে রয়েছেন। তিনি একেবারে কাজ নিয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছেন।

—নির্ঘাত ধাপ্পা দিয়েছে তোমায়, ভেতরে ঢোক নি তো?

ঢুকি নাই সত্য। কিন্তু পরেশবাবুর মত একজন সামান্য পরিচিত ব্যক্তি অসামান্য পরিহাস করিয়া বসিবেন কোন্ হিসাবে তাহারও কোন সদ্‌যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

বৌদিকে বুঝাইতেও পারি না—তিনি একইভাবে হাসিয়া বলেন—ছুটি যদি, ত' আছেন কোথায়? সত্যি ত' আর পাগল নয় যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন? সেই ত' পৌনে ন'টায় ভাত দুটো মুখে দিয়েই ছুটেছেন। ওই ছুটির জন্যে বলে—গত বছর সে কী মর্মান্তিক ব্যাপার—

—তার মানে?

বৌদি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবার সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িয়া বলেন—তা হলে শোন বলি—একঘেয়ে সংসার করতে করতে তো ভাই পচে গেছি, কোথাও এক পা বেরোনো নেই, বাবা মারা গিয়ে পর্যন্ত বাপের বাড়ি যাওয়া ঘুচে গেছে—থেকে থেকে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় কোথাও গিয়ে একটু হাঁফ ফেলে আসি। ভেবে চিন্তে ধ'রলাম তোমার দাদাকে—চল একবার পুরী যাই, দু'জনে একলা।···হাসছো যে, দু'জনে একলা হয় না?—সত্যি, সংসারের ঝামেলা ঘাড়ে করেই যদি যাবো তো কলকাতা কি দোষ করলো? চব্বিশ ঘণ্টাই তো তোমার দাদার সঙ্গে চলেছে আজকাল—

বাধা দিয়া বলিলাম—ঝগড়া চলছে—আপনাদের ? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না, বোধ করি সখের ঝগড়া !

—সখের ? ওই আনন্দেই থাকো—রীতিমত দেনা পাওনার হিসেব-নিকেশ, বুঝলে ? যাক গে, শুনে আসছি বরাবর—সমুদ্রের হাওয়ায় যেমন ফুটো ফুসফুস রিপু হয়, তেমনি, ঝাঝ্‌রা প্রেম ঝালাই হয়—তাই পুরীর বায়নাই নিলাম। এদিকে পাঁচজনের কাছে বলতে হয়—'জনন্নাথ টেনেছেন'—নইলে মান থাকে না। একলা বেড়াতে যাবো বললে তো ফাঁসির হুকুম !

·· জগন্নাথও টেনেছেন—আমারও ট্রাঙ্ক স্নুটকেস সব গোছানো—ছেলেমানুষের মতন আহ্লাদে রাত্রে ঘুম নেই, দিনরাত সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছি; হঠাৎ যাওয়ার আগের দিন ঘ্যাঁচ্‌ করে বলে বসলেন—ছুটি পাওয়া গেল না, বড়সাহেব রাঁচি না কোন্ চুলোয় যাচ্ছে।···বোঝো ব্যাপার ! মনে হ'ল গলায় দড়ি দিয়ে আফিঙ্ খাই।···সে মানুষ নাকি দু'সপ্তার ছুটি পেয়েছেন, হুঁ। তাও আবার আমি জানি না।

গল্প লেখার বাতিক আছে—যেখান-সেখান হইতে প্লট যোগাড় করি, হঠাৎ মনে হইল—রহস্যের আবরণে ঢাকা যে প্রচ্ছন্ন বেদনার কাহিনীটুকু এইমাত্র শুনিলাম তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক করুণ ছন্দের গল্প লেখা যায়।

কিন্তু থাক গল্প, পরে লিখিলেও চলিবে—সোজাসুজি বোকা বনিয়া থাকা চলে না। বিচিত্র নয়—যে প্রবোধদা' 'ঘর পর' উভয়কে লুকাইয়া নূতন কোথাও চাকরির উমেদারী করিতেছেন, হঠাৎ একদিন পাঁচ-সাত শো টাকার পোস্টে বসিয়া তাক্ লাগাইয়া দিবেন সকলকে।

—খুব। এক টেবলেই কাজ করে যে —

—তবে? ভদ্রলোক নিজে বললেন—প্রবোধদা' দু'সপ্তাহ ছুটিতে রয়েছেন। তিনি একেবারে কাজ নিয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছেন।

—নির্ঘাত ধাপ্পা দিয়েছে তোমায়, ভেতরে ঢোক নি তো?

ঢুকি নাই সত্য। কিন্তু পরেশবাবুর মত একজন সামান্য পরিচিত ব্যক্তি অসামান্য পরিহাস করিয়া বসিবেন কোন্ হিসাবে তাহারও কোন সদ্‌যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

বৌদিকে বুঝাইতেও পারি না—তিনি একইভাবে হাসিয়া বলেন—ছুটি যদি, ত' আছেন কোথায়? সত্যি ত' আর পাগল নয় যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন? সেই ত' পৌনে ন'টায় ভাত দুটো মুখে দিয়েই ছুটেছেন। ওই ছুটির জন্যে বলে—গত বছর সে কী মর্মান্তিক ব্যাপার—

—তার মানে?

বৌদি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবার সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িয়া বলেন—তা হলে শোন বলি—একঘেয়ে সংসার করতে করতে তো ভাই পচে গেছি, কোথাও এক পা বেরোনো নেই, বাবা মারা গিয়ে পর্যন্ত বাপের বাড়ি যাওয়া ঘুচে গেছে—থেকে থেকে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় কোথাও গিয়ে একটু হাঁফ ফেলে আসি। ভেবে চিন্তে ধ'রলাম তোমার দাদাকে—চল একবার পুরী যাই, দু'জনে একলা।...হাসছো যে, দু'জনে একলা হয় না?—সত্যি, সংসারের ঝামেলা ঘাড়ে করেই যদি যাবো তো কলকাতা কি দোষ করলো? চব্বিশ ঘণ্টাই তো তোমার দাদার সঙ্গে চলেছে আজকাল—

বাধা দিয়া বলিলাম --ঝগড়া চলছে—আপনাদের ? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না, বোধ করি সখের ঝগড়া !

—সখের ? ওই আনন্দেই থাকো—রীতিমত দেনা পাওনার হিসেব-নিকেশ, বুঝলে ? যাক গে, শুনে আসছি বরাবর —সমুদ্রের হাওয়ায় যেমন ফুটো ফুসফুস রিপু হয়, তেমনি, ঝাঝ্‌রা প্রেম ঝালাই হয় —তাই পুরীর বায়নাই নিলাম। এদিকে পাঁচজনের কাছে বলতে হয় —'জনন্নাথ টেনেছেন'—নইলে মান থাকে না। একলা বেড়াতে যাবো বললে তো ফাঁসির হুকুম !

·· জগন্নাথও টেনেছেন —আমারও ট্রাঙ্ক স্যুটকেস সব গোছানো —ছেলেমানুষের মতন আহ্লাদে রাত্রে ঘুম নেই, দিনরাত সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছি; হঠাৎ যাওয়ার আগের দিন ঘ্যাচ্‌ করে বলে বসলেন —ছুটি পাওয়া গেল না, বড়সাহেব রাঁচি না কোন্ চুলোয় যাচ্ছে।···বোঝো ব্যাপার ! মনে হ'ল গলায় দড়ি দিয়ে আফিঙ্‌ খাই।···সে মানুষ নাকি দু'সপ্তার ছুটি পেয়েছেন, হুঁ। তাও আবার আমি জানি না।

গল্প লেখার বাতিক আছে —যেখান-সেখান হইতে প্লট যোগাড় করি, হঠাৎ মনে হইল —রহস্যের আবরণে ঢাকা যে প্রচ্ছন্ন বেদনার কাহিনীটুকু এইমাত্র শুনিলাম তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক করুণ ছন্দের গল্প লেখা যায়।

কিন্তু থাক গল্প, পরে লিখিলেও চলিবে —সোজাসুজি বোকা বনিয়া থাকা চলে না। বিচিত্র নয়—যে প্রবোধদা' 'ঘর পর' উভয়কে লুকাইয়া নূতন কোথাও চাকরির উমেদারী করিতেছেন, হঠাৎ একদিন পাঁচ-সাত শো টাকার পোস্টে বসিয়া তাক্ লাগাইয়া দিবেন সকলকে।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করি।

বলাবাহুল্য —বৌদি উক্ত আকাশ-কুসুমে লেশমাত্র আস্থা স্থাপন করিলেন না, উপরন্তু আমাকে ঘোলের সরবৎ খাইবার অনুরোধ করিলেন। অর্থাৎ রোদে ঘুরিয়া মাথা গরম হইয়া যাওয়া নাকি অসম্ভব নয়, অগত্যা প্রতিকারার্থে ঘোল।

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম —কিন্তু অসময়ে পাবেন কোথায় ?

—মজুত রাখতে হয়, নইলে তোমাদের 'ঘাল' করবো কি করে ? বলিয়া বৌদি বেশ সশব্দেই হাসিয়া ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গেই উপর হইতে পিসিমার কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিল —নিচে কে এসেছে বৌমা ? কার যেন গলা পেলাম ?

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই বৌদি ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া নির্বাক থাকিবার ইঙ্গিত করিলেন। অবাক হইবার মত কথা— কিন্তু বেশী হই না, কারণ দীর্ঘদিন পরে দেখা হইলেও বৌদির পূর্বকালের কৌতুকপ্রিয়তার কথা বিস্মৃত হই নাই।

মিনিটখানেক পরেই পিসিমার আরো অধীর স্বর শোনা যায়— বৌমা, হঠাৎ চুপ করে গেলে যে ? বলি এই এতক্ষণ তো বেশ দিব্যি হাসাহাসি চলছিল।

ভাবিলাম এইবার বোধ হয় হাসিয়া ফেলিবেন বৌদি, কিন্তু ঘটনাটা ঘটিল অন্যরূপ, গলার সুরে কৌতুকের লেশমাত্র নাই, তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন —আপনি তো ঘুমোচ্ছিলেন —হাসাহাসি শুনলেন কখন ?

ঘুমোচ্ছিলাম বই ত' মরে থাকি নি বাছা ? বেতো মানুষ পা নিয়ে নড়তে পারি নে, তাই সাপের পাঁচ পা দেখেছো বটে ? ব্যাটাছেলের গলা আমি শুনেছি—

রহস্যের গতি যে এমন জঘন্য মোড় লইবে —এমন কল্পনা স্বপ্নেও করি নাই, অপ্রতিভভাবে উঠিতে চেষ্টা করি —কিন্তু উঠিতে পারি না। বৌদি আমাকে আরো অবাক করিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে হাত ধরিয়া সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া বলিয়া ওঠেন—থাকো চুপ করে, দেখি কত চেঁচাতে পারেন।

—কিন্তু লাভ কি এতে ?

—লাভ আবার কি ? বরং লোকসান।

—তবে ?

—কিছু না। খুশি আমার, বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না তাই সর্বদাই সন্দেহ —ওঁর অসাক্ষাতে কখন কি করে ফেলছি। বাড়িতে কেউ এলে দু'দণ্ড কথা কইবার জো নেই, অমনি ডাকাডাকি। ছিলই বাতিক, পঙ্গু হয়ে পর্যন্ত বেড়েছে। দুঃখের কথা ব'লবো কি —মেয়ে দুটো বড় হয়ে অবধি তাদেরও শান্তি নেই, যেন মেয়েমানুষ মাত্রেই খারাপ হ'বার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে — যেন খারাপ হবার ইচ্ছে থাকলে কেউ কাউকে শাসনের জোরে আটকাতে পারে!

ছেলেবেলায় পিসিমার কাছে আদর খাইয়াছি, আবদার করিয়াছি, স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিখানিই স্মরণে ছিল, একই ব্যক্তি একের কাছে অমৃত ও অন্যের কাছে গরল হয় কেমন করিয়া কে জানে ?

—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথার দোষ ঘটে নাই তো ?

সন্দেহ প্রকাশ করিবামাত্র বৌদি যেভাবে অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইলেন, সেটা কেবলমাত্র মেয়েমানুষের পক্ষেই সম্ভব!

নিতান্ত সাধারণ মেয়েমানুষ, যাহারা কথায় কথায় ছড়া কাটিতে পারে, অন্যের উপর আক্রোশ করিয়া ছেলে ঠ্যাঙায়, ঠ্যাঙ্

ছড়াইয়া বসিয়া এক কাঁসি সজিনাখাড়ার সঙ্গে পতিদেবতার মস্তকটি চর্বণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না,...কিন্তু বৌদি কি এদের একজন মাত্র?

এমন একটা সময় ছিল যখন এই বৌদিই ছিলেন প্রায় আমার আদর্শ। সেই সঙ্গীত-বিভোর রবীন্দ্র-পাগল তরুণীটি হারাইয়া গেল কোথায়?

বিশ বছর আগে পূর্বরাগের চলন বেশী ছিল না—থাকিলেও স্কুলের ছাত্রীর ঊর্ধ্বে আর উঠিত না, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে যে তাহারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের চাইতে কিছু কম ওস্তাদ ছিল, এমন মনে করিবার হেতু নাই।

স্কুলের ছাত্রী হইয়াও বৌদি কেমন করিয়া টিফিনের সময় স্কুল পলাইয়া হেদোর মাঠে আসিয়া হাজির হইতেন, এবং প্রবোধদা' কলেজে প্রক্সি ঠেকাইয়া আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রদগ্ধ লোহার বেঞ্চে বসিয়া সেই অমূল্য সময়টুকুর প্রতীক্ষা করিতেন, সে খবর আর কাহারও জানা না থাকিলেও আমার ছিল।

দশ বছরের ছোট বড় হইলেও কেমন করিয়া যে প্রবোধদা'র বন্ধুর পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না; হয় ত' আমার অকালপক্কতা ও তাঁহার সরল সহৃদয়তার যোগফল।

মোট কথা, তাঁহাদের প্রেমে পড়ার আগাগোড়া ইতিহাস সঠিক বলিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। এক রকম আমাকে সাক্ষী রাখিয়াই অগ্রসর হইতেন তাঁহারা—ইচ্ছা করিয়াই যেন একটু আড়াল রাখা, অবাধ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় কিঞ্চিৎ খর্ব করা।

প্রায়ই কোনো ছুতায় আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন—এবং

বোধ করি নিতান্ত শিশুবোধে আমাকে জলছবি ও ডালমুট ঘুস দিয়া নিকটেই কোথাও বসাইয়া রাখিতেন।

বলা বাহুল্য, প্রবোধদা'র ধারণা অনুযায়ী সরল শৈশবকাল তখন পার হইয়াছি—নিবিষ্টচিত্তে ডালমুট খাওয়ার ভাণে উৎকর্ণ হইয়া প্রেমালাপের সমস্ত অক্ষরগুলি কর্ণস্থ করিতাম, এবং অন্তরস্থ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিছু কিছু যে না করিয়াছি এমন নয়।

বেশ মনে আছে, একদিন অভিমানের সুরে অনুযোগ করিয়াছিলেন বৌদি—সোমেনকে রোজ রোজ আনো কেন বলো ত'?··· ভয় করো বুঝি? কেন, বাঘ না ভালুক আমি?

স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্যে উত্তর করিয়াছিলেন প্রবোধদা'—ভয় তোমায় করি না নিরু, করি নিজেকে, আমিই না কোনো সময় বাঘ ভালুক ব'নে যাই এই ভয়।

—ইস্, তবু যদি খোলা পার্ক না হ'ত।

—দুপুর রোদে খোলা পার্কেই বা ভরসা কি?

অস্বীকার করিব না, সেই বয়সে পক্ক কম ছিলাম না। একটা কিছু অনুমান করিয়া অন্যমনস্কের ছলে খানিকটা দূরে সরিয়া গেলাম, এবং আড়চোখে দেখিতে লাগিলাম খোলা পার্কের মর্যাদা থাকিল না গেল।

থাক সে সব কথা, তবে বিবাহের পর বৌদির অনুগত ভক্তদের মধ্যে আমিই প্রধান। লজ্জানম্র নববধূর রহস্যঘন পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করিয়া নিকটে পৌঁছিবার দুঃসাহস আর কার থাকতে পারে আমি ভিন্ন?

যেন আমারই বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য, মনে মনে এমনি একটা

আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম, মুগ্ধ করিয়া দিত তাঁহার হাসি, গল্প, গান, সেতার বাজানো, কবিতা আবৃত্তি সব কিছুতে।

বয়সের তারতম্য না থাকলে বোধ হয় সেই অন্ধ আনুগত্যকে প্রেমের পর্যায়ে ঠেলিয়া দিয়া লোকে অপবাদ দিয়া বসিত। নিতান্ত বালক বলিয়াই সে যাত্রা রেহাই পাইয়াছিলাম।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে আকর্ষণ কখন শিথিল হইয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে? এখন সমস্ত দিন-রাত্রি, সমস্ত চিন্তা-কল্পনা, অতীত-ভবিষ্যৎ সব গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে বেণু, পৃথিবীতে কখনো কোনো প্রিয়জন ছিল সেটুকুও মনে পড়ে না।

অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় যে আনন্দটুকু বোধ করিতেছিলাম তাহার সুর কাটিয়া গেল। আরো বেসুরো লাগিতেছে পিসিমার ভাঙা গলার উচ্চ চীৎকার।

বোধ হয় নাতিনীদের উদ্দেশ করিয়াই বলিতেছেন—মেয়েগুলোও কি হয়েছে তেমনি বজ্জাত, অজ্ঞান হয়ে নাটক নভেল পড়ছে—বাড়িতে কে এলো গেলো তার হিসাব নেই। ওরে শ্যামলী, অ-হারামজাদা মেয়ে, বলি আছিস কোথায়? কানের মাথা খেয়েছিস নাকি—দেখ্‌না নিচেয় নেমে কে এসেছে?

শ্যামলী বোধ করি অজ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ হইতে একবার মাথা তুলিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—কে আবার আসতে যাবে ঠাকুমা, তোমার দিনরাত্তিরই ওই এক বাতিক।

কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম কে জানে—দুই মিনিটও হইতে পারে, দশ মিনিট হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক সময় মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম—বৌদি, আপনার বয়স কত হ'ল?

—চৌত্রিশ, কেন ?

—এই সব সহ্য করেন এখনো ?

—কি করবো বলো, বাড়ি থেকে তো চলে যেতে পারি নে ?

—বিদ্রোহ করতেও তো পারেন ?

—ওরে বাবা ! কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বৌদি গালে হাত দিলেন —বললে কি সোমেন ? স্বর্গাদপি গরীয়সী ! বরং নালু-টুলুর বৌ এলে এর শোধ নেব। বলিয়া চমৎকার একটু হাসিলেন।

অথচ এমনই হয়, এই অবিশ্বাস্য রহস্যও সত্য হইয়া উঠে। সারা জীবনের সঞ্চিত তিক্ততার গ্লানি সুদে আসলে উসুল হয় পরবর্তীদের জীবনে।

এরপর পিসিমার সঙ্গে দেখা করিবার স্পৃহা না থাকিলেও কর্তব্য বোধে করিতে হইল। ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ খাইলাম — বিবাহ-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল পিসিমার গোচরীভূত করিলাম। অবশেষে স্যুটকেস ঘাড়ে করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম।

থাকিবার ইচ্ছা অনেকক্ষণ লুপ্ত হইয়াছিল। দূর ছাই—বেণুদের বাড়িই ভালো।

দুইদিন বাদে তো জামাই হইবই।

প্রবোধদা'র সংবাদটা সঠিক জানিতে আর একবার আসিলেই চলিবে, আপাততঃ দক্ষিণ কলিকাতার দিকে রওনা হই। আর্ল স্ট্রীটে বেণুদের বাড়ি, দশের-এ বাস হইতে রিচি রোডের মোড়ে নামিয়া ভাবিলাম 'ম্যাডক্স' পার্কের ভিতর দিয়া পথটুকু সংক্ষিপ্ত করিয়া লই,

কিন্তু কে জানিত মূর্তিমান বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল পার্কের মধ্যে!

গরমকালের চারটে আন্দাজ বেলা, চারিদিকে রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, মাঠের এই রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখিয়া অনুমান করা কঠিন — ঘণ্টাদুই পরেই এখানে শান্তির হাওয়া নামিবে, দলে দলে রঙীন প্রজাপতির মেলা বসিয়া যাইবে, জাতি ধর্ম্ম বর্ণের অপূর্ব সমারোহে!

কিন্তু যা বলিতেছিলাম —

বিস্ময় বসিয়াছিল প্রবোধদা'র বেশ ধরিয়া।

মুখের সামনে ছাতা আড়াল করা থাকিলেও—সর্বাঙ্গের পরিচিত ভঙ্গীটুকু যেন আমাকে কাছে টানিয়া আনিল।

প্রবোধদা'-ই বটে—বিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া যাই, কথা তিনিই আগে ক'ন। আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া ছাতা সরাইয়া প্রশ্ন করেন —কিরে, তুই হঠাৎ দুপুর রোদে এখানে? এলি কবে? যাচ্ছিস কোথায়?

—সব বলছি, আগে তোমার খবর বলো।

—আমার। আঁমার আবার খবর কি?....হাওয়া খাচ্ছি।

—হাওয়া খাচ্ছো? সময় ভালো —হাওয়া খাবার উপযুক্ত, কিন্তু এ রকম রহস্যময় হয়ে উঠলে কবে থেকে? অফিসে গিয়ে শুনলাম ছুটিতে আছো, অথচ—

বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বলেন—ছুটিই তো, নইলে পার্কে বসে আছি কি করে?

বেঞ্চের অপরার্ধ দখল করিয়া কহিলাম —কিন্তু বাড়িতে জানাও নি কেন?

—কে বললে জানাই নি ? সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেন প্রবোধদা'।

—বাড়ি গিয়ে শুনলাম, বৌদি ত'…

—বাড়ি গিয়ে ?

অকস্মাৎ ভূত দেখিয়া চমকাইয়া ওঠেন প্রবোধদা'।

—বাড়ি গিয়েছিলি ? ফাঁস করে এলি ছুটির কথা ?

—বলব না কেন তাও বুঝছি না।

—বুঝবে কোথ্‌থেকে ? আকাশে পান্‌সি ভাসিয়ে প্রেমের পাল তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছো—বুঝবে কি করে কত ধানে কত চাল। সর্বনাশ করে এলি একেবারে…মামলায় হারিয়া আসার মতই হতাশায় ভাঙিয়া পড়েন প্রবোধদা'।

সান্ত্বনা দিব, না অপরাধ স্বীকার করিব, সেটাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—বাড়ি ফেরবার আর পথ রাখলি না আমার, মিলিটারী লরী চাপা পড়ে আর ফিরতে না হলে বেশ হয়। উঃ, কত কষ্টে যে এই বারোটা দিন আত্মগোপন করে আছি—চেনা পাড়া দিয়ে হাঁটি না, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে ছাতা আড়াল করে স'রে চাই, একপথে ছ'দিন বেড়াই না, পাছে বলে দেয়…আর অক্লেশে আমার মাথাটা খেয়ে এলি ? —অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট !

এতদিন পরে দেখা—কুশলপ্রশ্নের পরিবর্তে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকেন প্রবোধদা'।

কিন্তু এই দীর্ঘ বিলাপোক্তির মধ্য হইতেও আত্মগোপনের মূল তথ্য আবিষ্কার করিতে পারি না। অনুমানের উপর আস্থা হারাইয়া সোজাসুজি প্রশ্নই করিতে হয়।

বিস্তর সাধ্য সাধনায় মুখ খুলিল।

পকেট হইতে একমুঠা ঝালছোলা বাহির করিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গম্ভীর সুরে কহিলেন —নে খা'। নিজেও একগাল চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনা সুরে বলেন —ছুটির কথা লুকোচ্ছি কি আর সাধ ক'রে? অনেক দুঃখে,—জানালে কি আর রক্ষে ছিল রে? ওৎ পেতে বসে থাকে, বুঝলি? পরের চাকরি করি, কথাটি কইতে পায় না —ছুটির গন্ধ পেলে বাঘের মতন হালুম করে পড়ে। রবিবার দিয়ে দেখেছি তো? রাজ্যের কাজ তুলে রেখে দেয় ওই একটি দিনের জন্যে।

হাসিয়া প্রশ্ন করি —এত কিসের কাজ?

—কিসের? কিসের নয়? ঝাঁজিয়া উঠিয়া মেয়েলী ভঙ্গীতে আঙুলের পর্ব গুণিতে থাকেন —ছুটি পেয়েছো, এ মেয়ের পাত্তর খোঁজো, ও মেয়ের তত্ত্ব পাঠাও, বুড়ো শ্বশুরের খবর আনো, রুগ্ন শালীকে দেখে এসো —কত বায়নাক্কা। তা ছাড়া, সেলাই কল ভেঙে আছে, পায়খানার ট্যাঙ্কে জল নেই, রান্নাঘরের ছাদ ফুটো, কাপড়ের অভাবে লজ্জা বাঁচছে না, ঝি পালিয়েছে, ধোপা আসে না, তেল নেই, কয়লা নেই —বলে কি না কিসের কাজ! হুঁ। এর ওপরে আবার মা জননীর দেশের বাড়ি নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি লেগেই আছে। সম্পত্তির মধ্যে একখানা ভাঙা দালান, আর একটা বুড়ো ডুমুর গাছ, তাই জ্ঞাতিরা ভোগ করছে বুক ফেটে যাচ্ছে। এতদিন ছুটি দেখলে অতিষ্ঠ করে ছাড়তেন, বুঝেছিস? দেখলে না, দেখলে না,—আরে বাপু চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের ডুমুর গাছ পাহারা দিলেই খুব শান্তি হ'ত তোমার?

যেন আমিই প্রতিপক্ষ।

হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসি চাপা দায় হয়।

তবে হাসি দেখিয়া রাগ করেন না, উদার ভাবে বলেন —হেসে নে, যে ক'দিন পারিস।

বলিলাম, ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে আরামটা কি ভোগ করছো? এই রোদে টো টো ক'রে—

দাদা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন —রোদে টো টো করবো না তো বালিগঞ্জের পাড়ায় কে আমার সুইটহার্ট বসে আছে, যে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বরফজল খাওয়াবে শুনি?....আরাম না থাক স্বস্তি আছে বাবা। ন'টা বাজলেই দিব্যি কেটে পড়ি; যতক্ষণ খুশি ঘুরে বেড়াই, যেখানে খুশি বসে থাকি, খিদে পেলে ছোলাভাজা কিনি, তেস্টা পেলে সোডা খাই, —ছ'টা বাজবার আগে বাড়ির দিকে পা বাড়াই না। কলকাতার রাস্তাগুলো ভুলে গিয়েছিলাম রে, আবার সব মুখস্থ করলাম।—বেশ লাগে গরমের দুপুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াতে।

বেশ লাগার নজীরটা ভালো।

কিন্তু বৌদির কথা ভাবিয়া দুঃখিত হই। আহা, বেচারার সমুদ্রের স্বপ্ন সফল হইলেও হইতে পারিত।

আচমকা প্রশ্ন করিয়া বসি—তার চেয়ে বৌদিকে নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে এলে পারতে? ধর পুরী—

—পাগলের মত কথা বলিস নে সোম, বৌদিকে নিয়ে পুরী, যেন সাহেব বিবি? আরে বাপু —বুড়ো মাকে একটু তীর্থ করাতে পারি নে, নিজেরা বেড়াতে যাবো কোন্ লজ্জায়? এই তো, আর বছরেই ঝোঁকের মাথায় একবার বলে বসেছিলাম, ব্যস্ তোড়জোড় দেখে কে? 'এটা চাই ওটা চাই' ইয়া লম্বা এক ফর্দ, যেন হনিমুনে

যাচ্ছে। এদিকে মার মুখ ভার—আর সত্যিই তো বুড়ো বয়সে তাঁর ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা হাওয়া খেতে যাওয়াটা কি ন্যায্য? আমিও আজকাল চালাক হয়েছি —ছুটি 'ক্যান্সেল' করে দিয়ে বললাম —পেলাম না, বড়সায়েব রাঁচি গেছে —বাবা, সাপও মরলো লাঠিও বাঁচলো।

অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকি —সত্যই কি এটা খাঁটি মনের কথা? না যাহা দেখিতে শুনিতে ভালো—তাহার ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করিয়া নিজের 'ভালোত্ব'টা জাহির করিবার কষ্টকর চেষ্টা মাত্র?

যাহারা প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিয়া চলে, তাহারা বঞ্চিত জীবনের সমস্ত গ্লানির দায় পরস্পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয় কোন্ হিসাবে?

ফেরারী আসামীর মত হাস্যকর ভাবে নিজেকে তাড়াইয়া বেড়ানোর চাইতে অবসর উপভোগ করিবার আর কোনো ভালো পথ এরা খুঁজিয়া পায় না কেন? স্বল্পাবসর জীবনের বিরল কয়েকটি মুহূর্ত রঙিন করিয়া তুলিবার ক্ষমতা কি ইহাদের সত্যই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

প্রবোধদা' আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন —অমন মনমরা হয়ে গেলি যে? ভাবছিস তোর বৌদি খুব দুঃখিত হ'ল?—দুঃখিত হওয়া তার কুষ্ঠীতে লেখে নি বুঝলি? আগুন আগুন, দিনরাত টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। কখন কি মেজাজ বোঝা ভার। তাইতো সেদিন বেশ ভালো মনে বললে —চল 'উদয়ের পথে' দেখে আসি, আমিও রাজী হয়েছি—মানে অফিসের সবাই ধন্যি ধন্যি করছিল বইটাকে, ভাবলাম দেখি ব্যাপারটা—

তা সে, যেই বলেছি —মেয়ে ছুটোও চলুক, আবদার নিচ্ছে, ব্যস অমনি বলে বসলো—যাবো না! বোঝো কথা? আসলে এই মেয়েমানুষ জাতটাই হিংসুটে, বুঝলি সোমেন?

কি বুঝলাম কে জানে, বোধ হয় মেয়েমানুষ জাতটার ভয়াবহ হিংস্রতার কথাই চিন্তা করিতেছিলাম—

হঠাৎ ফোঁস্ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধদা বলিয়া ওঠেন—ও আমাকে সুদ্ধু হিংসে করে জানিস? বিশ্বাস করতে পারিস? বলে কিনা —আমি নাকি আফিসের কাজের ছুতোয় দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই—আমার নাকি বয়েস ছাড়া কাঁচা চেহারা—আর উনি হরদম সংসার করে করে বয়েস ছাড়া বুড়িয়ে যাচ্ছেন—বোঝো? আরে বাপু দিনরাত মনের ভেতর আগুন জ্বালালে আর শুকিয়ে যায় না মানুষ?

যাইতে পারে—যাওয়াই সম্ভব, কিন্তু জলের পরিবর্তে **অ**বিরত ইন্ধন পড়িলেই বা মানুষ করে কি? সে আগুন কে ঠেকাইয়া রাখিবে কোন্ শুভবুদ্ধির জোরে?

পার্কে লোক আসিতে সুরু করিয়াছে। সামনে দিয়া ছুইটা ছেলে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ছুই-একটি বড়লোকের বাড়ির ঝি, রঙিন জামা পরা কাঁচের পুতুলের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া মদগর্বে ধরার দিকে সরার ন্যায় অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া ছায়াচ্ছন্ন জমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ যেন প্রবোধদা'র হুঁস্ হয়, পকেট উল্টাইয়া ধুলা ও খোসা সমেত বাকী ছোলাভাজাগুলা হাতে ঢালিয়া ফুঁ দিতে দিতে বলেন —নিজের কথাই সাত কাহন, তোর খবর বল্। তোর বেণুর খবর বল্।

কেমন যেন শ্রান্ত লাগিতেছিল, উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলি—শুনো পরে, যাবো কাল-পর্শু। হ্যাঁ ভালো কথা, ও ছুটির কথাটা তুমি চেপেই যেও বাড়িতে, হেসে উড়িয়ে দিও, বোলো—ঠাট্টা করে গেছে সোমেন।

—পাগল! আর এখন বিশ্বাস করলে তো?

বলিলাম—ঠিক করবেন, মজা এই—বিশ্বাসটা এখনো ঘোচে নি, ওটা গেলে দাঁড়াবার আর ঠাঁই থাকবে না বলেই বোধ হয় প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াই।

—এটা কি হ'ল?

—কিছু না, এমনি—আচ্ছা চলি—বলিয়া দাদার সবিস্ময় প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিতে সুরু করি।

—আমিও উঠি এবার—চল্ এক সঙ্গেই যাই।

ছাড়াছাড়ি হইবার মুখে সহসা প্রশ্ন করিলাম—কলেজ পালিয়ে দুপুর রোদে হেদোর ধারে বসে থাকার কথা মনে পড়ে প্রবোধদা?

প্রবোধদা যেন আচমকা হোঁচট খাইলেন, চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া কি বলিতে গিয়া থামিলেন। আর দুই পা আগাইয়া গিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—পড়বে না কেন, পড়ে—তোরই কি একদিন মনে পড়বে না—দুপুর রোদে ভবানী-পুরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো?

যা হয় তাই

ছিমছাম মাজাঘষা মেয়েটি! হয়তো—বিয়ের বয়েস পার হয়ে গেছে, কিন্তু চেহারা দেখলে—ধরা পড়ে না। অথচ কাজ হচ্ছে তা'র 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।'

রোদে ঘুরছে, বৃষ্টিতে ভিজছে, অনেক পথক্লেশ সইছে, স্নানাহারের ব্যাপারে ঘড়ির শাসন মানছে না, মোষ তাড়ানোর নেশায় পাগল।

কি লাভ ?

সেই তো কে বলে ? সহজবুদ্ধি মানুষ তো লাভ খুঁজে পায় না!

অমিতা নিজে বলে—'একজনের ভেতরেও যদি কিছুটা শুভবুদ্ধির সঞ্চার করাতে পারি, সেই পরম লাভ!'....তাই বা পারছে কই ?

আসল কথা 'বাতিক!'

'দারুণ দেবতার ডাক যে পেলো—তার আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে!'

নিজের সুখের ঘরে আগুন লাগিয়েই পথে নেমেছে অমিতা! অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, সুশ্রী চেহারা, লেখাপড়া যথেষ্ট করেছে, মোটা রোজগারী বর একটি সংগ্রহ করে ফেলে সুখে আরামে জীবন কাটাতে পারতো, তা নয়—গেল কিনা, 'শিশুকল্যাণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করতে।

জলে ভিজে রোদে পুড়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অজ্ঞ উদাসীন অশিক্ষিত মায়েদের মনে শুভবুদ্ধির জোগান দিতে। অনেক স্বপ্ন অনেক আশা! সোনার ছেলে তৈরি হবে দেশে।

আজকের অভিযান অমিতার, তাদের সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশনে—নামকরা শিশুকল্যাণকামী জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে এনে, অন্তত কিছু সংখ্যক মাতৃজাতিকে জড়ো করে তাঁর বক্তৃতা গিলিয়ে দেবার চেষ্টায়।

সাবিত্রী তো ওর কথা শুনে হেসেই খুন!

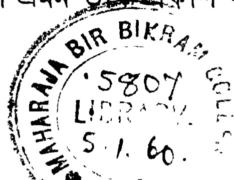
বলে—আমি যাবো সভায় লেক্‌চার শুনতে? তা'হলেই হয়েছে!

অমিতা বোঝায়—আপনারাই তো শুনবেন, নইলে শুনবে কে? শিশুদের গড়ে তোলবার ভার আপনাদের হাতে। আপনাদের বুঝতে হবে, শিখতে হবে, কি ভাবে তৈরি করবেন ওদের।

সাবিত্রী এ উপদেশ আমল দেয় না, হেসে বলে—হায়, হায়, তৈরি করবো? কাকে? আমার ছ'মাসের ছেলেটাও বোধ হয় ইত্যবসরে নিজেই তৈরি হয়ে বসে আছে। বড় দু'টির কথা তো বলে কাজ নেই! পূর্বে যেতে বললে ঠিক পশ্চিমেই যাবে! আমি তো ওদের সম্বন্ধে আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

অমিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলে—এটা একটা কথা হলো না। শিশু-মানেই ভবিষ্যৎ জাতি। আবার জাতি মানেই দেশ। তা'হলেই বুঝুন—এই দেশের'ই ছোট ছোট অংশ গচ্ছিত রয়েছে আপনার কাছে, সে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না আপনি।

তবু সাবিত্রী হাসতেই থাকে, এত বড়ো দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো এমন ভাব প্রকাশ পায় না তার মুখে চোখে!



হেসে কুটি কুটি হয়ে বলে—কিন্তু যাব্বো কি করে তাই বলুন? দেখছেন তো আমার অবস্থা? একটি কোলে, একটি পিঠে, একটি হাতে। এদের ব্যবস্থা কি করি? এদের নিয়ে যাওয়াও চলে না, রেখে যাওয়াও অসম্ভব।······বলে ছ'মাসে একদিন একটা সিনেমা দেখতেই যেতে পারি না, তা' সভা-সমিতি! শুনে হাসিই পাচ্ছে কেবল।

তুলনা শুনে অমিতার অবশ্য ওর হাসিতে-ফুলে-ওঠা গালের ওপর একটা থাবড়া বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু অনন্ত ধৈর্যের অধিকারী না হলে জনহিতৈষী হওয়া যায় না। ধৈর্যকে মূলধন করেই একাজে নামা! তাই ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলে—বাড়িতে এমন কেউ নেই যে দু'ঘণ্টার জন্যে রেখে যেতে পারেন?

—থাকবে না কেন, আছে মানুষ। কিন্তু করছে কে? শাশুড়ীই তো রয়েছেন, দু'ঘণ্টা রাখলে রাখতে পারেন, কিন্তু বৌ লেক্‌চার শুনতে যাচ্ছে শুনলে ঘাড় পাতবেন? সে হবার নয়। আমাদের কাছে আপনাদের উপদেশ বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো। মিথ্যে কষ্ট করতে এলেন। আমি সার বুঝেছি ছেলেপুলে যা হবার হবেই। অবস্থা মতন খেতে পরতে দেবো—বাস, চুকে গেলো। রাখবার হলে—'খোদায় রাখবে।'

অমিতা আর একবার ধৈর্যকে স্মরণ করে। মুখের ভাব প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা ক'রে বলে—বেশ তো কি খেতে দেওয়া উচিত, কি পরতে দেওয়া ভালো, সেটাও তো বিবেচনা করা দরকার?······ আর বলছেন 'খোদায় রাখবে?' রাখে আর কই? অন্য অন্য দেশের শিশুমৃত্যুর হারের সঙ্গে এদেশের শিশুমৃত্যুর হারের তুলনা করলে শিউরে উঠবেন।

হঠাৎ একটু দমে যায় সাবিত্রী! কাল রাত্রে খোকার গা'টা যেন ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছিল! সকাল থেকে রান্নাঘরের গোলমালে দেখা হয় নি। একটু ভারী গলায় বলে—কি জানি অন্য দেশের খবর-টবর তো রাখি না ভাই, সাধ্যমতো যত্ন করি। ওসব হিসেব-টিসেব শুনতে গেলেই ভয় করে।

কি আশ্চর্য! ভয় যাতে ভাঙে তার জন্যেই তো—নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে আর একবার গুছিয়ে বসে অমিতা, জোরালো যুক্তির ধারালো অস্ত্রে কেটে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় সাবিত্রীর মনের বাধা।

অনেকক্ষণ যুঝে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় সাবিত্রী।

মনে ভাবে কি আর হবে, যতই হোক বারটা তো রবিবার আছে, বরের কাছেই গছিয়ে যাবে জোর করে। সত্যিই তো—একদিন তু'ঘণ্টার জন্যেও কোথাও নড়তে পাবে না এমন কি দাসখৎ লিখে দিয়েছে?

পথে বেরিয়ে অমিতা হাত-ঘড়িটা তুলে দেখে। পুরো বাহান্ন মিনিট বাক্যব্যয় করতে হলো এ ভদ্রমহিলাকে রাজী করাতে! কিনা তুটো হিতকথা শুনে কৃতার্থ করবেন। মাঝে মাঝে এক একটা বাড়ী গিয়ে এই রকমই অবস্থা হয়। তবে অনেকে আবার 'রং তামাসা' হিসেবেও আগ্রহশীল। শেষের দিকে একটা 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে'র লোভ না দেখালে তো সভা বসানো যায় না, সেইটার দিকেই লক্ষ্য থাকে তাদের!

তবু মন্দের ভালো।

অমিতার ছোট ভাইপোটা রোজ সকালে ভেজা ছোলার লোভে চিরেতার জলটা বিনা প্রতিবাদে গেলে।

অমিতার গমন পথের দিকে তাকিয়ে সাবিত্রীর একটা নিশ্বাস পড়ে। বেশ আছে ওরা! ওই তো—সাবিত্রীর থেকে এমন কিছু কম বয়েস নয়, অথচ কেমন ফ্রী। আর সাবিত্রী? তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে নাজেহাল জবড়-জং!

প্রস্তাব শুনে বর ব'কে ওঠে।

—এক কথায় ভাগিয়ে দিতে পারলে না? 'সুবিধে হবে না, যাবো না, ব্যস!' ও সব হচ্ছে দলে ভিড়োবার ফন্দী। যেতে টেতে হবে না।

এখানে সাবিত্রী অন্য সুর ধরে বসে—কেন? হবে না-ই বা কেন? কতো মেয়ে যাচ্ছে! জেলখানার আসামী তো নই, যে কোথাও ত্বদণ্ড নড়তে পারবো না? আমি যাবোই। ছেলেমেয়ে তিনটেকে দেখো ভালো, না দেখো—পড়বে, কাটবে, যা খুশি ক'রবে।

শিশির বিদ্রূপ হাস্যে বলে—তবে আর ঢং করে অনুমতি নিতে আসা কেন? বাড়ি বসে শোনা লেক্‌চারেই তো অনেকটা তৈরী হয়ে উঠেছো দেখছি, ময়দানে গিয়ে একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে এসো।

—আসবোই তো! বলি এত ভয়টাই বা কিসের?···শুনছো 'শিশু কল্যাণ সমিতি'—তারা আমাদের কি কু-মন্ত্রণা দেবে শুনি? ···সর্বদাই 'হারাই' 'হারাই' ভাব—কেমন? মুচকে একটু হাসে সাবিত্রী।

নারী জাতির সহজাত শিক্ষা।···মূর্খ হোক বিদ্বান হোক তফাৎ খুব বেশী নেই। জানে—কার্যোদ্ধার-কালে কোথায় রাশ টানতে হবে, আর কোথায় ঢিলে করতে হবে। এখন শিশিরকে চটানো

ঠিক নয়। সত্যি—তিনটে দস্যি দানোর ভার ঘাড়ে চাপিয়ে যাওয়া! ....খোকাটাকে নিশ্চয় একবার হরলিকস্ করে খাওয়াতে হবে, খুকুর আবদার সামলাতে হবে, জিতুটা হাত পা ভাঙছে কিনা তার তদারকিও দরকার!

এ দিকটা তো যা হয় হলো! এ ছাড়া—আবার রান্না ঘরের ব্যবস্থা!

শাশুড়ীকেই রাজী করতে হবে গুছিয়ে ব'লে-ট'লে।...আজকাল আবার রুটির ব্যাপার—এক হাতে করা কষ্ট।...তা বলে খোসামোদ করবার মত 'কাদার পুতুল' মেয়েও সাবিত্রী নয়। যা করবে কৌশলে।

লেক্‌চারের কথা তোলে না, বলে—নাচ গান হবে, সেই যে সকালের সেই মেয়েটি? যাবার জন্যে অনেক বলে কয়ে 'পাশ' দিয়ে গেছে।

শাশুড়ী বিষ মুখে প্রশ্ন করেন—মেয়েটা কে?

—কেউ তো নয় এমনি চেনা!

—কি জানি! তখন যেমন অজ্ঞান হয়ে গল্প করছিলে, ভাবলাম, কি জানি বাপের বাড়ির কেউ বুঝি!...তা নাচ গান দেখতে—ছেলে পুলে রেখে যাবার কী আছে? ওদেরই তো আমোদ!

ছ'মাসের ছেলেটার আমোদ অনুভব করার শক্তি কতোখানি এ কূটপ্রশ্ন করে না সাবিত্রী, এখন কাজ বাগানো নিয়ে কথা। তাই অনায়াসে বলে—টিকিটের ব্যাপার কি না, মাথা পিছু দু'টাকা করে টিকিট! আমাকে 'পাশ' দিয়ে গেছে তাই—

—কি জানি বাবা, ছেলেপুলে বাদ দিয়ে কী আমোদ আহ্লাদ!...যাবে যেও। কুটনো কুটে আটা মেখে রেখে তবে

যেও। আমার বুড়ো হাড়ে—ও তোমাদের আটার কাঁড়ি মাখবার ক্ষমতা নেই।

—হ্যাঁ সে তো যাবোই। বলেই ঝট্ করে উঠে পড়ে সাবিত্রী। কি জানি আবার যদি মন ঘুরে যায় গিন্নীর!

অবশেষে—যাওয়া হলো!

আলোকোজ্জ্বল হল্! মাননীয় সভাপতি আর প্রধান অতিথির জন্য উঁচু মঞ্চ। বেঞ্চির সারি।···ভর্তি হয়েছে কম নয়।···এত মেয়েও তো আসে বাবা! শোনাতে হবে শিশিরকে। ছোট ছাওর, সাবিত্রীকে দোর থেকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। একটু দিশেহারা হয়ে অমিতার মুখটা খুঁজে বেড়ায় বেচারা!···

ভেবেছে—সাবিত্রীকে দেখতে পেলেই নিশ্চয় অমিতা ছুটে এসে অবহিত হয়ে ভালো আসনে বসিয়ে দেবে। যে রকম অনুরোধ উপরোধের বহর!

একটি সাবিত্রীর মুখ মনে রাখা যে ওদের পক্ষে অসম্ভব, সে ধারণা সাবিত্রীর নেই।···ক'দিন ধরে কত মুখ দেখলো অমিতা, কত অনুরোধ করলো সে হিসেব সাবিত্রী কি জানবে?

যাক, জায়গা একটু জুটলো!

যে ভদ্রলোক ব'লবেন, তাঁর মুখের দিকে উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে সাবিত্রী, পাছে শুনতে না পায়! অবশ্য সে ভয় থাকলো না, মাইক্ এসে গেলো।

প্রথমে ধীরে ধীরে···ক্রমশঃ উদাত্ত ভাষায় অনেক বলতে লাগলেন ভদ্রলোক। দেশের দুঃখ দুর্দশার কথা···শিশুদের প্রতি অযত্ন অবহেলার কথা, শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ হার···খাদ্যহীন স্বাস্থ্যহীন

এই সব অবহেলিত শিশুদের শোচনীয় ভবিষ্যৎ....সরকারের ঔদাসীন্য....সমাজের ঔদাসীন্য, মা বাপের ঔদাসীন্য। বললেন, জননীর দায়িত্ব কতখানি, শিশুরা কি মূল্যবান সম্পদ....জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিশু রক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি....অবশেষে ধরলেন 'এদেশ' আর 'ওদেশের' তুলনা মূলক সমালাচনা। সম্প্রতি 'ওদেশ' থেকে ঘুরে এসেছেন, স্মৃতিটা টাটকা।

এসব কথা শুনতে যারা অভ্যস্ত, শুনে শুনে যাদের কানে কড়া পড়ে গেছে, তারা এ সব একঘেয়ে পুরনো কথায় বড়ো কর্ণপাত করছে না। ওর মধ্যে বান্ধবী-টান্ধবী একটা কিছু জোগাড় করে দিব্যি গল্প জমিয়েছে। আকর্ষণ শুধু পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।...জায়গা দখল করে বসবার জন্য আগে থেকে আসা।

কিন্তু সাবিত্রীর মতো যারা নতুন, তারাই শোনে মন দিয়ে।

সাবিত্রীর মতো যারা বড়ো কিছু পড়ে না, কোনো কিছু শোনে না, দরকার তো তাদেরই।

কি বিভোর হয়েই শুনছে সাবিত্রী। শোনে—এমন দেশও আছে যেখানে কোলের ছেলেরা কাঁদে না....দামাল বয়েসের ছেলেরা দস্যিবৃত্তি করে না....কোনো বয়সের ছেলেমেয়েরাই অবাধ্যতা করে না। সে দেশের ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করার কথা ভাবতে পারে না, মারামারির কথা তো মনের কোণেও আনে না। তারা—জীবনে কখনো জুতোর জায়গায় বই, আর বইয়ের জায়গায় জুতো রাখে না।...তারা বাড়ি অগোছালো করে না, রাস্তা অপরিষ্কার করে না। · তারা হ্যাংলা নয়....অসভ্য নয়, রাগী নয়।...

সেখানে শুধু স্বাস্থ্য, শুধু সৌন্দর্য,····শুধু নিয়ম····শুধু শৃঙ্খলা ·· শুধু আশা, শুধু ভরসা।

এই সবই সম্ভব হয়েছে—সে দেশের মায়েদের গুণে।

তাদের মায়েরা ছেলেমেয়েদের মারা দূরে থাক—কখনো ধমকে কথা কয় না, তারা—ধৈর্যের সঙ্গে পালন করে, বুদ্ধির সঙ্গে চালনা করে, ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা দেয়। তাদের পাঁচ বছরের ছেলেটা যা জানে বোঝে, এদেশের পনেরো বছরের ছেলেরা তা বোঝে না····

অথচ—

সেই সব মায়েরা চাকরী করছে, ক্লাব করছে, সমাজ সেবা করছে। বাজার করছে, রান্না করছে···এককথায় জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সমস্তই করছে।···তারা একাধারে—ঝি, রাঁধুনী, ধোবা, দর্জি।

উদাহরণ দিয়ে, গল্প দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দেন ভদ্রলোক। ওজস্বিনী সুরে ব'লে চলেন—

এদেশের মায়েরা যদি আজ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে স্থির করেন তাঁরা শুনবেন এই কথা, নেবেন এই শিক্ষা, তাহলে এদেশেও দেখা দেবে নবীন রবির আলো!

ভদ্রলোক থামেন।

হাততালি পড়ে। প্রধান অতিথির ভাষণ সুরু হয়।···নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে সাবিত্রী। ছোট দ্যাওর বেড়িয়ে ফেরবার সময় এখানে এসে গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকবে বলে রেখেছে। নাচ-গানগুলো আর শোনা হলো না।···না হোকগে।

কে জানে হয়তো ছেলেটা কান্নাকাটি করছে, হয়তো খিদে পেয়েছে ছেলেটার, বিরক্ত হয়ে শিশির দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়েছে।

অকস্মাৎ—অনুপস্থিত সন্তানদের মুখগুলি মনে করে মমতায় মন ভরে যায় সাবিত্রীর। আহা সত্যি কী বা পায় ওরা? ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক—'বঞ্চিত' 'অবহেলিত' 'নির্যাতিত'। নির্যাতন ভোগ করে বৈ কি বেচারারা!...সংসারের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। বড়দের নৈবিদ্যি সাজিয়ে তবে তো ওদের দিকে দৃষ্টি পড়ে! ক্ষিদেয় কাঁদলে তা'ও মার খায়।...

ছেলেদের সঙ্গে কবে খেলাধূলো করেছে তারা? কবে কতটুকু পরিশ্রম করেছে—তাদের জ্ঞানবুদ্ধির উন্নতি সাধন করতে?.. এই তো খুকুটা কী রোগা, কিন্তু খাওয়ার যত্নই বা কতটুকু হয়? অথচ এমন কিছু দরিদ্র অবস্থা তাদের নয়। নিয়ম করে ফল-টল কিছু মাখন, হলো না হয় ডিম-টিম—নাঃ, আর এরকম অজ্ঞান হয়ে দিন কাটাবে না সাবিত্রী। সন্তানদের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবে, বকবে না, রাগ করবে না, হাসিমুখে শুনবে তাদের আবদার! অবসর সময়ে নিয়ে খেলা করবে, খেলার ছলে দেবে শিক্ষা।

সারা রাস্তা স্বপ্ন দেখতে দেখতে যায় সাবিত্রী, যেন স্বর্গের হাওয়া এসে লেগেছে সাবিত্রীর ছোট সংসারে....দেবদূতের মতো শিশুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে—স্বাস্থ্যে সুন্দর, শিক্ষায় উজ্জ্বল—হাস্যময়ী সাবিত্রী, প্রসন্নবদন শিশির মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের পানে।

ছোট দ্যাওর সুধীর দু' একটা কথার পর বলে—বৌদি এমন চুপচাপ যে? লেক্‌চার শুনে ভাব লাগলো নাকি? কে কে বললো?

বললো!....সত্যিই তো কে বললো তাতো কই জানে না সাবিত্রী।

সুধীর হেসে ওঠে—দু'ঘণ্টা বসে রইলে—কোন্ কোন্ মহারথী এসেছিলেন তাও খবর রাখলে না? তোমাদের কিছু হবে না!

সাবিত্রী চুপ করে থাকে। পথের মাঝখানে তর্ক চলে না। 'হবে' কি না দেখিয়ে দেবে সাবিত্রী। 'কে' বললো—নাই বা মনে রাখলো, 'কি' বললো সেটা তো ভোলে নি!

বাড়িতে পা দিতেই খুকু তেড়ে ছুটে আসে, দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে আদর করে না, চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে—ওঃ ভারি মজা করে গান শুনতে যাওয়া হয়েছিলো, আমাদের নিয়ে গেলে না কেন?

সাবিত্রী মুখে হাসি টেনে বলে—আচ্ছা, এবারে যেদিন যাবো নিয়ে যাবো....চলো।

চার বছরের খুকু বারো বছরের মতো মুখভঙ্গী করে বলে—তোমার আর অত আদরে দরকার নেই। নিজে খালি আমাদের কষ্ট দিয়ে দিয়ে বেড়াতে যাবেন, আর ঠাকুমা খেটে মরবেন।

তোতা পাখীর জাত।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত চড়াৎ করে ওঠে সাবিত্রীর। মেয়ে কোলের কাছে থাকলেও, রান্নাঘর পর্যন্ত পৌছনর মতো গলা তুলে উত্তর দেয়—কেন? কবে কোন্ যমের বাড়ি যাচ্ছি? আর যদিই যাই, কেনা বাঁদী তো নয় কারুর!

প্রধান শ্রোত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বিষ-তিক্ত কণ্ঠে বলেন—পাঁচ ঘণ্টা বেড়িয়ে এসে এত মেজাজ কিসের বৌমা? তোমার ঐ সব দস্যিদানোদের সামলায় কে? শিশির আমার হপ্তায় একটা দিন মোটে ছুটি পায়, তার কি খোয়ার! এটা কাঁদছে

ওটা কাঁদছে, জিতেটা পড়ে দাড়ি কাটলো! কচিকাচার মায়ের অতো সখ করলে চলে না বাছা।

সাবিত্রী যতই সাধু সঙ্কল্প করে থাকুক, তা বলে—এ হেন অসঙ্গত কথা তো সত্যিই সহ্য করতে পারে না। উদ্ধতভাবে বলে—একদিন ছেলে আগলালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? ছেলে তো আমার একার নয়! তু' ঘণ্টার জন্যে গিয়েছি, ছেলে পড়ে গিয়ে দাড়ি কাটে, এই তো সামলানোর ছিরি।

শাশুড়ী আরো কিছু বলতেন হয়তো, নেহাৎ উনুনে চাটু চড়িয়ে এসেছেন বলেই একবার চলে যান। ঘর থেকে শিশির ধমকে ওঠে—কি হচ্ছে কি?

—হবে আবার কি! অন্যায় কথা শুনলেই হাড় জ্বলে যায়।

ধমকের সুর বজায় রেখে শিশির বলে—কিছু অন্যায় বলা হয় নি। এতক্ষণ পরে এসে দাঁড়ালেন একেবারে মিলিটারী মেজাজে। ...নাও শীগ্‌গির খাইয়ে দাও খোকাকে। ও সব খাওয়ানো-টাওয়ানো আমার দ্বারা সম্ভব হয় নি।

এতক্ষণ খায় নি ছেলেটা!

আর একবার··পায়ের রক্ত চড়াৎ করে মাথায় উঠে যায় সাবিত্রীর। অত করে গুছিয়ে বলে গেলো সে।

হ্যাচ্‌ করে ছেলেটাকে বিছানা থেকে টেনে নিতেই পরিত্রাহি কেঁদে উঠলো ছেলেটা!

অথচ ভোলাবার মত মানসিক অবস্থা সাবিত্রীর নয়। হঠাৎ যেন জল থেকে আগুনে পড়েছে।....কি চমৎকার ছিলো এতক্ষণ!

খুকু এসে আছড়ে পড়লো—খিদে পেয়েছে শিগ্‌গির দাও.... ঠাকুমা দিলে না···বললে—'বেরো দূর হ, মা'র কাছে যা?'

হুম্ করে খুকুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে—সাবিত্রী শানানো গলায় চীৎকার করে ওঠে—মা'র কাছে কেন, যমের কাছে যা! এতো হেনস্থা এতো দুর্দশা, তবু তোদের মরণ হয় না লক্ষ্মীছাড়ী!···

—থামো থামো—বকে ওঠে শিশির—চুপ করে থাকো।

এ হেন মধুর ভাষায় ছেলেমেয়েকে আপ্যায়িত করা সাবিত্রীর নতুন নয়, শিশিরের কানও অনভ্যস্ত নয়, তবে নাকি অনেকক্ষণ ঝালাপালা হয়ে গেছে, তাই মেজাজ খাপ্পা।

সাবিত্রী হয়তো অন্যদিন হ'লে চুপ করেই যেতো—কিন্তু আজ যেন সব এলোমেলো হ'য়ে গেছে।····সগর্জনে বলে ওঠে—চুপ করবো একেবারে সেইদিন, যেদিন বাক্-রোধ হয়ে যাবে। তার আগে নয়।····বাড়ি নয়তো—গারদখানা। বেশ ছিলাম এতক্ষণ।

শিশির বিদ্রূপতিক্ত হাস্যে বলে—তা থাকবে বৈকি! আরো উড়তে শিখলে আরো থাকবে।···বাড়ি তখন গারদখানা কেন, নরকপুরী মনে হবে। সাধে কি আর মেয়ে-মানুষের বেরোনো মানা।

—বৌমা, অ বৌমা, বলি এসে কি শুয়ে পড়লে বাছা? সুধীর খাবে বলে বসে আছে সেই থেকে—

শাশুড়ীর স্বর ভেসে আসে ওদিক থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কাটা দাড়ি ঘিরে একটা ময়লা ন্যাকড়ায় ফেট্টি বাঁধা জিতু কোথা থেকে এসে মায়ের মুখের সামনে দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে বলে ওঠে—'দুয়ো' 'দুয়ো' মিথ্যুক! সব মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেছে; গান শুনতে যাবো বলে লেক্চার শুনতে যায়! ছোটকাকা বলে দিয়েছে ঠাকুমাকে—ঠাকুমা তোমায় ছেঁচবে!

আর সহ্য হয় না সাবিত্রীর !

—হতচ্ছাড়া ছেলে বড় বাড় বেড়েছে, না ? নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—বলেই তা'র মাথাটা ধরে ঠাঁই ঠাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে, অফুরন্ত ক্রন্দনরত কোলের ছেলেটাকে বিছানায় ফেলে তার পিঠেও একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে।

বোধ করি খিল লাগিয়েই দেয়।

তিনটি ভাইবোনের ঐকতানে পাড়া মুখরিত হয়ে ওঠে।

খোকার ছ'মাসের জীবনে প্রহারের আস্বাদ এই প্রথম।

অথচ সাবিত্রীকে কি দোষ দেবো আমরা ? অসহিষ্ণু বলে ? নিষ্ঠুর বলে ?

এ ছাড়া আর কি করতো—সাবিত্রীর জায়গায় আর কেউ ?

কি করে—হাজার হাজার সাবিত্রীর দল ?

শিক্ষা, সহানুভূতি, ধৈর্য, মমতা—সাবিত্রীর কাছ থেকে আশা করতে যাবো আমরা কোন্ মুখে ? কোথায় পাবে সে ? তা'কে কে কবে দিয়েছে ও সব ?

কে জানে—আয়ো কতকাল ব্যর্থ হবে অমিতাদের অভিযান !

কে জানে—সত্যিই কোনোদিন সার্থক হয়ে উঠবে কি না তাদের সাধনা !

টেক্কা

তিন মেয়ে আগেই এসে গেছে।

বড়, মেজ, ছোট। নেহাৎই কাছে পিঠে থাকে তারা, তাদের আসার মধ্যে না আছে প্রতীক্ষার উত্তেজনা, না আছে কৌতূহলের রোমাঞ্চ। হামেশাই তো আসা যাওয়া করে তারা বাসে, ট্রামে, রিক্‌শায় —ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে আসছে বলেই কি আর নতুন হয়ে গেছে।

বড় মেয়ে সুষমা যে রিক্‌শার বদলে আস্ত একখানা ট্যাক্‌সীতে চড়ে এসেছিল —সে শুধু এবার সব ছেলেমেয়ে ক'টাকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনেছে বলেই। সাতটি ছেলেমেয়ে মানেই তো সাত বস্তা জামা কাপড়! কাজেই কমপক্ষেও গোটা তিন-চার ট্রাঙ্ক স্যুটকেস।

মেজ, ছোট যেমন আসে তেমনিই এসেছে নিজের নিজের সুবিধে মত। অসুবিধেয় পড়বার ভাবনাও নেই! ওরা বাপের বাড়ি এসে থাকলে তল্‌পীবাহকরা তো নিত্য সন্ধ্যাবেলা এসে হাজ্‌রে দেবেই। কি হবে মেলা বাক্স-বিছানার ঝামেলা বাড়িয়ে?

কিন্তু সেজ মেয়ে অণিমার কথা একেবারে স্বতন্ত্র।

তার আসাটাকে নেহাৎ 'আসা' মাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! 'আগমন' বল্‌লেই ভালো হয়। আর —আগমনের জন্যেই তো প্রতীক্ষার উত্তেজনা!

ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে সাত বছর পরে বাঙলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করলো সে!

আবার সাত বছরটাও শেষ কথা নয়।

রাজপুতনার মরুভূমি থেকে ঘষটাতে ঘষটাতে দিন তিনেক পরে শুকনো শুকনো মুখ আর উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে বাঙলার মাটিতে এসে ঠেকার সাধারণ রীতির বদলে একেবারে তাজা চেহারা নিয়ে আকাশ থেকে অবতরণ!

সে মহিমার জন্যে কৌতূহলের রোমাঞ্চ থাকবে বৈ কি।

শূন্যপথের মহিমা এদের মত গৃহস্থদের ঘরে এখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি।

সকাল থেকে তাই সকলের মধ্যেই অলক্ষ্যে একটা 'সাজ সাজ' ভাব। কিছুটা ত্রস্ততা কিছুটা চাঞ্চল্য।....'অণু এসে পড়বে—কাজ-কর্ম সেরে নে সবাই'...'অণু এলো বলে, ঘরদোরগুলো গুছিয়ে ফেল তোরা'...'সেজ মাসী আসছে শীগ্‌গির খেয়ে নে খোকন'....'সেজমাসী আসছে জামা-কাপড় ময়লা করিসনে খুকু'....অনবরতই শোনা যাচ্ছে এমনি সব শব্দ।.......আবার বোধ করি উত্তেজনার লজ্জা ঢাকতে মাঝে মাঝে যোগ করা হচ্ছে—'আহা কতকাল পরে আসছে বেচারা!'......সেইটাই একমাত্র কারণ ঔৎসুক্য আর চাঞ্চল্যের। যেন সেজ জামাইয়ের পদমর্যাদার গুরুতর ওজনটা কিছুই নয়। যেন অনেকদিন বাপের বাড়ি আসতে না পাওয়ার মত দুঃখজনক কারণটা নেহাৎই বেচারা করে তুলেছে তাকে।

বিয়ের বর নিজেই গেছে বিমানঘাঁটি থেকে অভ্যর্থনা করে আনতে, মোটা টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে ট্যাক্‌সী চড়িয়ে আনবে। এ ত আর নেহাৎ গেরস্থ সেজ পিসি নয়, যে—শ্রীরামপুর থেকে নিয়ে আসতে গিয়েও মনে মনে হিসেব কষতে বসা হবে—ইণ্টারে না এনে থার্ড ক্লাসে আনলে খরচটা কতটা কম হতো! এ অণু।

অবশেষে এলো সেই পরম মুহূর্ত।

দিদিরা ছুটে এলো, এলো ছোট বোন ও তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, এলেন মা আর বাবা। ঝি চাকর, বিয়ে বাড়ির আগন্তুক অভ্যাগত সবাই এলো আশে পাশে পিছনে।

বিরহের আর আনন্দের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ মা'র চোখ দিয়ে জল পড়লো দু'ফোঁটা, দিদিরা প্রকাশ করলো স-কলরব আনন্দোচ্ছ্বাস, ছোটবোন তনিমা ঈষৎ ঈর্ষান্বিত হলো তন্বী সেজদির তনুলাবণ্যে। ভাবলে—হবে না কেন, ছেলেপুলে না হলে অমন সবাইয়েরই—

শুধু হতাশ হলো ছোট ছোট বোনপো বোনঝিরা।

মা'র আর মাসীদের থেকে খুব বেশী প্রভেদ আবিষ্কার করতে পারলো না তারা অ-পূর্বদৃষ্ট সেজমাসীর মধ্যে থেকে।...এই সেজমাসী! এর জন্যে এতো আয়োজন!

—দেখলি—বাচ্চু, বাবলু, মা ঠকিয়ে ঠকিয়ে তাড়াতাড়ি খাইয়ে নিলো। ধেৎতারি, খেলবি চল্'—বলে দলপতি খোকন শিশুবাহিনী নিয়ে প্রস্থান করলো।

অতঃপর বড়ো বাহিনীরা তৎপর হলো—অণিমার পথক্লেশ দূর করতে। ক্লেশ যতোই না হোক, সেইটাই যে স্নেহ প্রকাশের একমাত্র পথ।

—মা—! অণুকে কি ওই শুকনো গজা আর অপরূপ বোঁদে দিয়ে জল খেতে দেওয়া হবে নাকি?

মা'র কাছে এসে ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে প্রশ্ন করলো মেজ মেয়ে প্রতিমা। মাও এতোক্ষণ ঠিক ওই কথাই ভাবছিলেন, বিয়েবাড়ির বিরাট পর্ব জলখাবারের হিল্লে করতে বুদ্ধি করে দু'দিন আগে থেকে দেদার

বোঁদে আর গজা ভাজিয়ে রেখেছেন বটে, কিন্তু অণুর সামনে প্রথম নম্বরেই সে বস্তু বার করা সম্ভব কিনা। অথচ 'শাঁখ সন্দেশ' 'রাজভোগ রসগোল্লার' প্রস্তাবটা অন্য মেয়েরা কিভাবে নেবে কে জানে। তাই মেয়ের প্রশ্নে দুর্বলভাবে বললেন —তাতে আর কি হয়েছে ? ঘরের মেয়ে—

—তা'হলে—তুমিই দাওগে যাও, আমার দ্বারা হবে না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে প্রতিমা।

অতএব নিরুপায় হয়েই বলতে হয় সরমাকে—তবে না হয় বাপু এক কাজ কর, ভাঁড়ার ঘরে পুরুত মশায়ের জন্যে ভালো মিষ্টি আনা আছে, ঠাকুরঝিকে বলে বার করে নে, আমি আবার আনিয়ে রাখছি।

—তাই বলো বাবা—বলে আঁচল উড়িয়ে চলে যায় প্রতিমা ভাঁড়ার ঘরের উদ্দেশে।

—মা, মাছের ন্যাজাগুলো সমস্তই এ্যাতো টুকু টুকু করে কাটা হয়েছে মানে ? সুষমা মোটা দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এলো—অণুর পাতে কি দেওয়া হবে ?

'ওদের ওখানে মাছ পাওয়া যায় না'—এমনি একটা অজুহাতে মা মাছের ন্যাজার আয়তনের কথা সকালবেলা একবার তুলেছিলেন বটে, তবে নানা কাজে সম্পূর্ণ তদারকী করে উঠতে পারেন নি! ইতস্ততঃ করে বলেন—কে জানে বাছা, গৌর কোন্ ফাঁকে কুচিয়ে রেখেছে! কি আর হবে ? ওই দি গে যা, বরং দু'খানা দাগার মাছ বেশী করে—

—বেশী তো আনিয়েছো কতো—মা'র কানে ঢুকতে পারে এমন অস্ফুট স্বরে মন্তব্যটি করে আবার রান্নাঘরের দিকে হাঁসফাঁস করতে করতে এগোয় সুষমা।

বিয়ের এখনো ছু'চারদিন দেরী, সত্যই কিছু রোজরোজ আর ঝাঁকা ভর্তি মাছ আনতে পারছেন না সরমা, নেহাৎ খাবার মানুষের আন্দাজেই হিসেব করে আনান। কাজেই অপমানটা নীরবে পরিপাক করে নিতে হয়। না নিলে উপায় কি? উত্তর দিলেই তো বচসা! তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে? 'বোবার শত্রু নেই' এই নীতিই সব থেকে গ্রহণযোগ্য নীতি।

ছুপুর বেলা—তনিমা এসে টেনে নিয়ে যায়—বাবার ঘরের শেতল পাটি, আর দাদার ঘরের টেবিল ফ্যান্। সেজদির দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের আয়োজন-ভার নিজেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে সে। গরম এখনো তেমন পড়ে নি বলে, বিয়ে বাড়ি হলেও—ঘরে ঘরে পাখার ব্যবস্থা চালু করা হয় নি, কিন্তু সেজদির সম্বন্ধে তো হাতপাখা নিয়ে মাটিতে পড়ে ঘামার ছবি কল্পনা করা যায় না!··· নিজের বাড়িতে নাকি শোবার ঘর 'এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড করা' অণুর। সেজদির সুখ-সুবিধের দিকে সতর্ক পাহারা না দিলে?···ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বইতে থাকেন।

অণুর সুখ-সৌভাগ্যের মহিমায় সবাই বিনম্র। অণুর রূপগুণের আলোচনায় প্রত্যেকে মুখর।

কিন্তু অণিমা কেন হাঁপিয়ে উঠছে?

ওযে কিছুতেই সকলের সঙ্গে সমান হতে পারছে না। অথচ কিসের এই ব্যবধান?····বড়লোক বলেই কি?····কিন্তু ও যে বড়লোক এ তথ্যটা সকলের মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে চেষ্টার তো ত্রুটি করছে না? বিনয় আর অমায়িকতায় তো টেক্কা দিচ্ছে সবাইকে।

নিজে থেকে আহামরি করে খেয়েছে—পাঁচদিনের বাসি গজা আর

শুকনো রোঁদে, ভাঁড়ার ঘরের স্যাঁৎসেঁতে মেঝেয় বসে মহোৎসাহে লেগে গেছে সজনে ডাঁটা ছাড়াতে; যে দেশে তরকারির রাজা সজনে ডাঁটা আর মাছের রাজা কুচো চিংড়ি দুর্লভ, সেই অখাদ্য মেড়োর দেশের ব্যাখ্যানায় পঞ্চমুখ হয়ে—'আহা' কুড়িয়েছে মা পিসির কাছে! ধূলো কাদা মাখা, আর হাতে পায়ে খড়ি ওঠা, বোনপো বোনঝিগুলোকে টেনে টেনে তেল ঘষেছে, সাবান মাখিয়েছে, গল্প বলে বলে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে সব ক'টাকে। বাচ্চাগুলোকে কোলে করে বেড়াচ্ছে অনায়াস ভঙ্গীতে। বেছে বেছে পরছে—অপেক্ষাকৃত সস্তা শাড়ীগুলো, অনেক সন্ত্রস্ত নিষেধ হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে—খুঁজে খুঁজে করছে রাজ্যের ওঁচা কাজগুলো। রাত্রে নেটের মশারি ঢাকা স্বতন্ত্র বিছানার প্রলোভন ত্যাগ করে বোনেদের সঙ্গে মাটিতে ঢালা বিছানার একপাশে নিচ্ছে আশ্রয়,....তবু কিছুতেই কেন একাত্ম হ'তে পারছে না ওদের সঙ্গে?

এখনো—এততেও কি ওরা ঠেলে রেখেছে অণিমাকে সমীহর দূরত্ব দিয়ে?

কিন্তু তাই বা বলা যায় কি করে?

অনেকটাই তো সহজ হয়ে গিয়েছে সকলের ব্যবহার।

সরমা নিজেই তো যখন তখন ডেকে ডেকে ফরমাস করছেন এটা ওটা। ওর সেলাইয়ের হাত সূক্ষ্ম বলে বাবা রিপু করিয়ে নিয়েছেন পুরনো পাঞ্জাবীর ফাটা ঘাড়।

তবু কেন বাইরে পড়ে থাকে অণু?

কিছুতেই কেন ভেতরে ঢুকতে পারে না? ওদের রাজ্যে অণুর প্রবেশ নিষেধ করলো কে? সে রাজ্যে ঢোকবার টিকিট কি?

বোনে বোনে এক হলেই মজলিসের ঘটা !

তার ওপর আবার সমবয়সী সেজপিসি! যেমনি আমুদে, তেমনি বক্তা,—সোনায় সোহাগা। বিয়ের উৎসবটা উপভোগ করছে বটে এরা। খেতে বসে এঁটো থালার সামনে একবেলা কেটে যায়, রাত্রে বিছানায় শুয়ে আকাশ ফর্সা হয়ে আসে গল্পের ঠেলায়।

প্রত্যেকেই বক্তা।

বক্তব্যের আর শেষ নেই। ছেলেমেয়েগুলো ওঠে···কাঁদে···বলে 'গরম হচ্ছে'····'খিদে পাচ্ছে'···—এরা তখন রেগে উঠে খানিকটা চেঁচায়, দু'চার ঘা ঠেঙানি দেয় আর বলে 'কী জ্বালা'! আবার স্থুরু করে পুরনো গল্পের জের থেকে।···আর মজা এই —ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে আলোচনাই করুক তার মূল ওই 'জ্বালা'।

অবিশ্যি সে 'জ্বালাটা' ঠিক ছেলে কান্নার নয়।

সেই সব জ্বালা-কেন্দ্রিক ঘোরালো আলোচনার নায়ক হচ্ছে—নৃশংস পুরুষজাতির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি পতিদেবতা। তাদের দুর্ব্যবহারের জ্বালায় অহরহ ছটফট করছে এরা।

কোলের ছেলেটাকে থাবড়াতে থাবড়াতে স্থষমা স্থতীক্ষ্ণ মন্তব্য করে—বলিসনে ভাই বলিসনে, পুরুষ জাতটাই অমনি। হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল একেবারে। এই পায়ের বেড়িগুলো যদি না থাকতো তো কোন্‌দিন ওঁর ঘর সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দেশত্যাগী হ'তাম।····রাগের বেলায় পর্বতপ্রমাণ রাগ আছে বাবুর, তখন পৌরুষ দেখে কে? কর্তব্যের বেলায় দেখগে—কচি-খোকাটি!····এমন বেতালা কথাবার্তা শুনলে মনে হয় জলে ডুবি না আগুনে পুড়ি। এই এদিনেই দেখ্‌ছ না, আসবার আগে পরামর্শ করতে গেলাম 'বিন্নুর বৌকে কি দেবো', মস্ত বিবেচনা দেখিয়ে বললো

কিনা —তা চারটে টাকার কমে মুখ দেখলে কি ভালো দেখাবে ? শোন তোরা ? এতে মানুষের মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে কি না ? এই দু'মাস হলো চার হাজার টাকা খরচ করে নিজের বোনের বিয়ে দিয়েছে, আজ আমার ভাইয়ের বিয়েতে চারটে টাকা নগদ বিদেয়। আমিও ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়। আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে চৈতন্য করিয়ে দিলাম, তখন তড়বড় করে গিয়ে এম, বি, সরকার থেকে দেড়শো টাকা দিয়ে একটা পেন্‌ডেণ্ট এনে হাজির !....দেখে হাসবো না কাঁদবো ? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে যার খালি গলায় বেড়াচ্ছে, তাঁর এতো নবাবী ! রেখে দিয়েছি হারটা রমার জন্যে। বৌভাতের দিন পরিয়ে দেবো দেখিস। বুদ্ধি করে এখানের স্যাকরাকে দিলাম একটা আঙটি গড়াতে ! এমনি করে সংসার চালাতে হয় আমাকে। দিনরাত তাই বলি —কি করবো, হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, নইলে কোন্ কালে তালাক দিয়ে চলে যেতাম। কথায় পারে না আমার সঙ্গে !

বক্তব্য শেষ করে বেশ একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সুষমা। যেন এইমাত্র সেই প্রতিপক্ষকেই নিয়েছে এক হাত।

প্রতিমার বক্তব্য আর এক প্রকার।

বরটি তার কচিখোকা তো মোটেই নয়, বরং অতি পাকা। 'বৌ' পদার্থটিকে পরম পদার্থ ভাববে—এমন বোকামি তার নেই। পয়সা জিনিষটা যে তার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান, এ জ্ঞান তার আছে। কোনো সাধ আশাই তাই পূর্ণ হয় না প্রতিমার। সে ক্ষোভ তার প্রতি কথায়।

বলে—হ্যাঁ; বুঝতাম যে পয়সার অভাব, কি করবে। থাকতেও যে 'নেই নেই' 'হায় হায়' করে, এই ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে

করে আমার। সখ কোরো না—সাধ কোরো না, ছেলেপুলের একটা আব্দার মিটিও না, দিনরাত ওর সংসারে দাসী বাঁদীর মতো খাটো, তাহলেই ওর পক্ষে খুব ভালো। যদি বলেছো—'চাই' কি 'দরকার' ব্যস তা'হলেই মারমুখী।...কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলবো! আমার অবুঝপনার জন্যে নাকি ওকে চুরি ডাকাতি করতে হবে এবার! জামাইবাবু তো দেড়ভরি সোনা বের করেছেন, ও কি একটা সিঁদুর কৌটোর উর্ধ্বে উঠবে? মনেও কোরো না তোমরা! অপমানের ভয়ে তুলিই নি ওকথা, যা বিবেচনা হয় করুক। কার মান অপমানের ভাবনায় যে এত চক্ষুলজ্জা আমাদের!...এই তো—আসার আগে বল্‌লাম—নিজের কথা চুলোয় যাক—ছেলেমেয়েদের তো পোষাক-আসাক কোনো ছাই নেই, কি পরে বিয়ে বাড়ি যাবে? শুনে এই লম্বা চওড়া এক লেকচার....'বিলাসিতাই নাকি সকল দুঃখের মূল, চক্ষুলজ্জাই হলো মহাশত্রু!....এ সব লোকের বিয়ে করে সংসার পাতবার কি দরকার বলতে পারো? কী ভাবে যে এই বারো বছর কাটালাম তা' আমিই জানি। আর কেউ হলে—

আর কেউ হলে যে একটা আত্মঘাতী কাণ্ড ঘটতে পারতো এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না—প্রতিমার দীর্ঘনিঃশ্বাসমিশ্রিত কথার সুরে।

অবাক হয়ে যায় অণিমা। সন্ধ্যে হতে না হতেই যখন অফিস-ফেরতা দুই জামাইবাবু সহাস্যবদনে শ্বশুরবাড়ি এসে ঢোকেন, তখন তো দিদি দুজনকে দেখলে এমন সন্দেহ মনের কোণেও আসে না যে ওই দুই পাষণ্ড ব্যক্তির নির্যাতনের জ্বালায়, একজন দেশত্যাগী আর একজন আত্মঘাতী হবার চিন্তা মনে পোষণ করছে।

সেজ পিসির জ্বালা আবার আর এক জাতের।

ভাইঝিদের সঙ্গে ধ্বনিগত পার্থক্য বড়ো বেশী না থাকলেও মূলগত প্রভেদ আছে। বরের দায়িত্বহীনতার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হচ্ছে সে অহরহ।

শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে ?·· ছেলের 'যায় যায়' রোগে লোকটা নাকি নিশ্চিন্ত চিত্তে দাবার আড্ডায় গিয়ে বসে থাকে, বৌয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে দেখে অম্লান বদনে ছিপ ঘাড়ে বেরিয়ে পড়ে তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে। রেশনের টাকা হাতে করে বেরিয়ে তাসের বাজী হেরে আসে, ছেলের পরীক্ষার 'ফী' জমা দেবার সঙ্গতি ভেঙে বন্ধুদের দলে ভিড়ে পুরী বেড়াতে যায়।····

নজীরের কি সংখ্যা আছে ?

ছেলে ছুটোর লেখা-পড়ার কথা ভাবে না, মেয়েটা বড়ো হয়ে উঠছে সে চিন্তা নেই, একা সেজ পিসি মেয়ে-পুরুষের কাজ চালিয়ে কী ভাবে যে ঠাট বজায় রেখেছে এই আশ্চয্যি।

নিজস্ব সরল ভাষায় বর্ণনা করতে থাকে সে—সে মহাভারত কি বলে ফুরোবার রে ? না—আদ্যোপান্ত পারবে কেউ বলতে ? ক্ষেপে কেন যাইনি এখনো, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।—ভাইফোঁটার দিন দাদাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠালাম, বাবু কলকাতায় এসে বন্ধুর বাড়ি আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যে বেলা সিনেমা দেখে, রাত ছুপুরে বাড়ি ফিরলেন! বাড়ার ভাগ ছাতাটি বিসর্জন দিয়ে গেলেন কোন্ চুলোয়! ছাতার যম! একটা মানুষ একটা জীবনে একে একে তেরোটা ছাতা হারিয়েছে—শুনেছিস কখনো এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ? ····এইবার এতোদিনে শিক্ষা হয়েছে আমার। আর দিই না, বলি—পুড়ুক রোদে, ভিজুক জলে। যার যেমন কর্মফল।

সুষমা বলে ওঠে—আহা সেই জেদ নিয়ে চুপ করে থাকলে

যদি চলতো! আমার 'ইনিটি'ও তো দু'দুবার শালর‍্যাপার হারালেন, 'লাগুক ঠাণ্ডা' বলে খালি গায়ে রাখতে পেরেছি? রোগে পড়লে ভুগবে কে? তুই না পাড়ার লোকে?

—ভুগি ভুগবো—সেজ পিসি উত্তর দেয়—ওর সঙ্গে তো ভোগারই সম্পর্ক! আমি তো ভেবে ভেবে বুঝেছি—সাত জন্মের শত্তুর মরে এক জন্মের ইষ্টি দেবতা হয়! ....'ও বলে মাঝে মাঝে—'হচ্ছে হচ্ছে তোমাদের সুখের দিন আসছে, ডাইভোর্স বিলটা পাশ হলো বলে,—বয়েস ফুরিয়ে যাবে না, তখন! দেখে শুনে মনের মতন একটা জোগাড় করো—।' আমি বলি—রক্ষে করো মশাই, আর কাজ নেই! আবার কোন্ চোদ্দ জন্মের শত্তুর এসে মালা বদল করতে চাইবে! তার চেয়ে এই ভালো। তবু সয়ে গেছে। 'বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভরী, সেই বিষেই গড়াগড়ি' এই দশা আমাদের!··· উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতেই কি কসুর করি? হায়া নেই। লজ্জা নেই। গাল খেয়ে গন্‌গন্ করে বেরিয়ে যায়, ইলিশ মাছ হাতে দাঁত বার করে বাড়ি ফেরে। কী জ্বালায় যে আমি জ্বলছি; সাধ করে বলি—ওর গুণের কথা লিখতে গেলে মহাভারত! · বলি তো তাই—আমি যাই মেয়ে তাই তোমার মতন লোকের সংসার করছি। আর কেউ হলে চুলোচুলি করেই দিন কাটতো! মায়া নেই মমতা নেই আক্কেল বিবেচনার বালাই মাত্তর নেই, কিম্ভূত!···· আরো বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে তবে থামে সেজ পিসি।····আরম্ভ করে তনিমা।

তনিমার জ্বালার রূপ আবার আরো কিম্ভূত। একেবারে আলাদা।

শুনলে অবাক লাগে!

ওর বরের নাকি ধারণা সংসার সুদ্ধ যতো পুরুষ, সবাই ওর বৌয়ের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে কুদৃষ্টি হানছে। বৌকে তাই অহরহ আগলে বেড়ায় ছোকরা।

—জেলের কয়েদীর অবস্থাও আমার থেকে ভালো!—মন্তব্য প্রকাশ করে তনিমা। নিজের দুরবস্থা বোঝাতে আরও প্রাঞ্জল করে আনে বর্ণনার ভাষা।—খেয়ে শুয়ে স্বস্তি নেই ওর। মণিব্যাগে পুরে রাখবার জিনিস নয়, লোহার সিন্ধুকে তুলে রাখবার জিনিস নয়, করে কি তাই বলো? চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতে পারলেই বাঁচতো! উপায় নেই, অন্নচিন্তা তো আছে? কোন্ প্রাণে যে অফিস যায় তাই ভাবি।…বাতিকে বাতিকে নিজে পাগল হবে, আমায় পাগল করবে।

—আসতে যে দিলে বড়ো? সেজ পিসি প্রশ্ন করে—চোখছাড়া করে এতোদিন রাখতে হবে তো?

সে কথা আর বোলো না! গলায় দড়ি দেবার ভয় দেখিয়ে তবে আসবার পারমিশন পেয়েছি। ওর ইচ্ছে সঙ্গে করে এনে নেমন্তন্ন খাইয়ে নিয়ে যায়! আমার এ জ্বালার কাছে তোমাদের ওসব কিছু নয় বাবা। সেজদি যোধপুর থেকে একা এসেছে শুনে ওতো অজ্ঞান।

এতোক্ষণে কথা কয় অণিমা—কই? একা তো আসি নি। সেই যে বল্‌লাম—অফিসের একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসছিলেন কলকাতায়—

—তবে তো আরো ভালো—মুখে কাপড় দিয়ে খুক খুক করে হেসে ওঠে তনিমা।

বলে—বেশ আছে সেজদিটা। কোনো জ্বালা নেই। বরটি সদাশিব,

ছেলেপুলের ঝক্কি নেই, অভাবের 'অ' কাকে বলে জানেনা। সংসার জিনিসটা যে কী চীজ্ বুঝতেই হলো না। দেখলে—হিংসে হয়!

যা বলেছিস। শ্যামলের মতন ভালো মানুষ তো আর দ্বিতীয় দেখলাম না।

হেসে ওঠে আর তিনজন।

—তাই আমাদের অণুর মুখে কখনো একটা বাক্যি শুনি না। আছে ভালো। সত্যি দেখলে হিংসা হয়।

'হিংসে হওয়ার' পক্ষে কোরাস্ দেয় বটে সকলেই. কিন্তু বলার ভাবে মনে হয় যেন করুণাই হচ্ছে ওদের।…যেন 'ভালো মানুষ' বরের মতো খেলো আর সস্তা জিনিস জগতে কিছু নেই! আহা তাই নিয়েই ভুলে আছে। বেচারা!

হঠাৎ নিজেকে ভয়ানক অপদস্থ লাগে অণিমার।

ভারি বঞ্চিত মনে হয় নিজেকে।

সত্যিই তো অণিমার কোনো বক্তব্য নেই।…ও যে সুখী আর সন্তুষ্ট সেকথা তো একবার বললেই পুরোনো হয়ে গেলো। তারপর? তারপরেই তো অণিমা মূক?…তাই ওরা অণিমাকে 'বড় লোক' করে সমীহ করে বটে, কিন্তু কৃপা না করেও পারে না—সুখী আর সন্তুষ্ট বলে। ভাবটা যেন—আহা বেচারা! বুঝলো না সংসার চীজ্টার ভেতর কতো রস।··বুঝলো না—'জ্বালা' নামক তীব্র দাহকারী কড়া মদটাকে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মধ্যে কী রোমাঞ্চকর স্বাদ!….আহা কী ফাঁকা জীবন ওর!

অপদস্থ অণিমা এইবার বুঝতে পারে কেন ও কিছুতেই দলে মিশে যেতে পারছে না, কিছুতেই পারছে না ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে।…ওর অভিযোগ নেই, বক্তব্য নেই।

তাহলে কি অণিমা খেলো হয়েই থাকবে ?

কেন ? সে কি আরো বেশী জিতে যেতে পারে না ? প্রমাণ দিতে পারে না আরো বেশী জ্বালার ? সেইটাই যখন এমন মূল্যবান সম্পদ !

তাই দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—দেখো নি তাই হিংসে করতে পারছো, দেখলে করতে না।

—কেন রে বাবু ? —প্রতিমা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে—তোর আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস কিসের ? শ্যামলের স্বভাবে তো কোনো দোষ দেখি না।···রূপে গুণে আলো করা—

অণিমার কি নেশা লাগলো ? প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার নেশা ?

তাহলে ?

তাই অবলীলাক্রমে বলছে—তোমরা তাই ভেবেই নিশ্চিত আছো, আমিও আর বলি না কিছু। কি হবে সবাইকে দুঃখ দিয়ে।

এবারে তিনজনেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে, উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—কি রে অণু ? কি ব্যাপার ? শ্যামলের স্বভাব চরিত্রে কোনো কিছু—!

—'কিছু' বলে আর অগ্রাহ্য করতে পারছি কই বড় দি ? এতোদিন তো নীরবে সয়ে এসেছি, এখন—অনেক কিছুই শুরু হয়েছে।

কথা শেষ না হতেই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে অণিমার।

কিন্তু শেষ করবার দরকারই বা কি ?

এইটুকুই তো যথেষ্ট। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা হয়ে গেছে তার।

অণিমার ওই অসমাপ্ত কটি কথার ধাক্কাতেই মুহূর্তে কতো তুচ্ছ হয়ে গেলো সুষমা, প্রতিমা, তনিমা, সেজ পিসি ?

বুদ্ধিহীন স্বামী নিয়ে ঘর করায় জ্বালা আছে বৈকি, মমতাহীন স্বামীর ঘরও দুঃখজনক সন্দেহ নেই, দায়িত্বহীন স্বামী নিয়ে সংসার করা কম যন্ত্রণাদায়ক নয়, আর সন্দেহবাতিক স্বামীর স্ত্রীর দুর্দশা তো বলে কাজ নেই, কিন্তু—

চরিত্রহীন স্বামীর ঘর করা ?

তার কাছে ও দুঃখগুলো হাস্যকর ছাড়া আর কি ? এরপর অণিমাকেই ঈর্ষা করুক ওরা !

ওদের রাজ্যে শুধু প্রবেশ করেই ক্ষান্ত হয় নি সে, ফার্স্টক্লাস টিকিটেই ঢুকেছে।

আচ্ছা—অণিমা কি অস্বাভাবিক ? অণিমা কি অবাস্তব ? ওর বোকামিটাই হাস্যকর পাগলামি ? তাই বা বলা যায় কি করে ?

সৃষ্টি করা দুঃখের যন্ত্রণা জাহির করে বেড়ানোর বোকামিটা কি একা অণিমারই ? আদি অন্তকাল থেকে—ওই জিনিসটাকে মূলধন করেই তো পৃথিবীতে চরে খাচ্ছে মেয়েরা। ওই তো প্রধান সম্পদ তাদের, পরম আশ্রয়।

নানা ছন্দে নানা ভাষায় সশব্দ উচ্চারণে, অনুচ্চারিত ঘোষণায় অবিরত তারা এই কথাই তো শুনিয়ে আসছে—'দেখো আমরা কত দুঃখী'....'দেখো—আমাদের কতো জ্বালা'....'দেখো—আমরা কতো সহ্য করে চলেছি!' 'অতএব—পূজার নৈবেদ্যটি আমাদের জন্য রেখো!'

এই তো পারমিট।

এর জোরেই তো আদায় করে আসছে তারা সুযোগ-সুবিধে, শ্রদ্ধা, করুণা...এর মহিমাতেই তো সেই অপরাধী পুরুষ জাতিকে

দিয়েই রচনা করাচ্ছে স্তবগান, সজাগ করে রেখেছে তাদের অপরাধ-বোধ।

দুঃখের বিলাস না হলে চলবে কেন মেয়েদের? এর চাইতে দামী বিলাসিতা আর কি আছে?

আচ্ছা—দৈব দুর্যোগে সত্যিই যদি পৃথিবীতে এমন দুর্দিন আসে, যেদিন অভিযোগ করবার কোনো পথ থাকবে না মেয়েদের? সাম্য-ব্যবস্থার রামরাজত্বে নারী-পুরুষের অধিকার-রেখা টানা হবে—একই লাইনে, সামাজিক সুবিচার, আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তালাচাবি পড়ে যাবে—চিরমুখর রমণীরসনায়। সেদিনকার সেই সত্যকার দুঃখী নিরাশ্রয় মেয়েদের চেহারাটা কি হবে? বক্তব্য ফুরোলে আর কি রইলো তাদের?

সেই বোবা মেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ঠাসা ফাঁকা মনের অগাধ শূন্যতা পূর্ণ হবে কি দিয়ে?

কি নিয়ে নিজেদের বিকশিত করে তুলবে সুষমা প্রতিমা সেজ পিসির দল?

কি দিয়ে টেক্কা দিতে চাইবে বোকা অহঙ্কারী অনিমারা?

নীল রক্ত

রাত নেহাত কম নয়—প্রায় সাড়ে বারোটা, হঠাৎ সাত নম্বর ফ্ল্যাটের গণেশবাবুর ঘর হইতে একটা তুমুল গোলমাল উঠিল। প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করি নাই, কারণ উনিশটি ফ্ল্যাট সম্বলিত এই বিরাটকায় প্রাসাদটির গহ্বরে যে উনিশটি পরিবার বাস করেন —তাঁহাদের আর যাই হোক উদারতার অপরাধে অপরাধী করা যায় না।

অতএব গোলমাল শুনিয়া কৌতূহলী হইবার অভ্যাস আর নাই।

বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে চটি জোড়াটা পায়ে গলাইয়া কাটিয়া পড়ি।

কিন্তু এত রাত্রে হঠাৎ "ষোলোই আগষ্টের" অভিনয় স্বুরু হইয়া যাইবার উদাহরণ বেশী নাই, একমাত্র শশধরবাবুর ঘরে ছাড়া। বৌদি বলেন—'শশধর বাবু মাতাল, তাই—', দাদা বলেন—'বাজে কথা! এক অফিসে কাজ করছি বিশ বছর ধরে, মাতাল হ'লে আমি জানি না? গিন্নীটা পাগল—।' আমি অবশ্য পাগল আর মাতালে প্রভেদ ধরিতে পারি না।

প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, মাঝে মাঝে হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সেই দাম্পত্য কলহের আদ্যন্ত শুনিতে হয় আমাদের।

কিন্তু গণেশবাবুর স্ত্রী তো আমি অনুপস্থিত বলিয়াই জানি।

কয়েকদিন আগেই যেন ভদ্রমহিলাকে ট্রাঙ্ক বিছানা ও ছেলে

মেয়েদের লইয়া গাড়ি চড়িতে দেখিয়াছি। তবে? গলাটা শোনা যাইতেছে গণেশবাবুরই বেশী, অতএব একপক্ষ তিনিই, কিন্তু অপর পক্ষ কে? একা গণেশবাবু এতোক্ষণ চালাইতেছেন কিসের শক্তিতে! কাহার প্রেরণায়?

নাঃ, কোলাহলটা ক্রমশঃই উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে যে! 'খুন করলে', 'পুলিশে দেবো', 'দেখে নেবো', 'বাবারে', 'মারে' প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো কথা কানে আসে। উঠিব নাকি? ব্যাপার কি?

এই সব চেঁচামেচি কেলেঙ্কারী দেখিলে আমার আবার মাথা ঘোরে। 'কাপুরুষ' বলিয়া ধিক্কার দিতে চান দিন—সত্য কথাই বলিতেছি।

উঠি উঠি করিয়াও থাকিয়া গেলাম।

ঝড়ের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। যাক্ পুলিশ ডাকার প্রয়োজন সত্যই ঘটে নাই এও ভালো। আশঙ্কায় কণ্টকিত হইতেছিলাম—কখন পুলিশ আসিয়া সজোরে দোরে ধাক্কা দেয়। বিচার বিবেচনার বালাই তো আর নাই, আমাকেই ধরিয়া চালান দিতে পারে।

পুলিশের না হোক, ধাক্কা পড়িল।

সজোরে নয়—সরবে।

—ঠাকুরপো, ঘুমোচ্ছো নাকি?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া দিই।—কি ব্যাপার বৌদি?

—ব্যাপার তো কুরুক্ষেত্তর! কিন্তু তুমি কি কুম্ভকর্ণ ঠাকুরপো?

—অপরাধ?

—বলো কি, এঁ্যা! ধন্যবাদ বাবা, কোটি কোটি প্রণাম তোমার

চরণে। 'মহাপুরুষ' নাম দিয়েছি কি সাধে? এই ধুন্ধুমার কাণ্ড হ'য়ে গেল, আর তুমি কিছু টের পাও নি? গণেশবাবু তো খুন হয়ে যাচ্ছিলেন!

'যাচ্ছিলেন?'

শুনিয়া তবু আশ্বস্ত হই। মনের ভাব প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করি না—যাচ্ছিলেন? যান নি তো? ঈশ্বর অনুগ্রহ করেছেন, কিন্তু হত্যাকারী কে? আপাতত তো উনি এখন বিপত্নীক? চমকো না —টেম্পোরারি তো বটে? রাতদুপুরে খুনোখুনি কার সঙ্গে?

—আচ্ছা ঠাকুরপো, এই বুঝি তোমাদের মনোভাব? খুনোখুনি করতেই আছি আমরা? তাই বিয়ে করো না, কেমন? খুন করতে বসে ছিলেন কে জানো? ললিতবাবুর মেয়ে সরমা!

ঔদাসীন্য বজায় রাখা কঠিন হইতেছে।

—ললিতবাবুর মেয়ে? গণেশবাবুকে খুন করতে গিয়েছিল? তার মানে?

—মানে আর কি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন সুন্দরী।

—চুরি? ললিতবাবুর মেয়ে? গণেশবাবুর ঘরে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। মেয়েটি তো চোরের অগ্রগণ্য, কে না জানে এ কথা? তুমি যেমন চোখ বুজে পৃথিবীতে চরে বেড়াও! ওর ভয়ে পকেটে পয়সা রেখে স্বস্তি পায় না লোকে, সুবিধে পেলেই টাকাটা সিকেটা সরাবে!

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটাইয়া বলি—রোসো, আমাকে বুঝতে দাও, গণেশবাবু তো ঘরেই ছিলেন?

আহা তা তো ছিলেন। ভেবেছে মিনসে ঘুমোচ্ছে, গিয়েছে চুপি চুপি।

বলা বাহুল্য ভাষা সম্বন্ধে কোনো কুসংস্কার বৌদির নাই, বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করতে তিনি আধুনিক পৌরাণিক সর্ববিধ ভাষাই প্রয়োগ করেন।

—এ পর্যন্ত তো বুঝলাম। তারপর? বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছিল, না কি গলা টিপে ধরেছিল?

বৌদি বিরক্ত হইয়া উঠেন—আহা তা' কেন? চুপি চুপি দেরাজটি খুলছিল, গণেশবাবু টের পেয়ে যেই না উঠে চেপে ধরেছেন, আর টেবিল থেকে ভারি কাঁসার গেলাসটা ধাঁই করে বসিয়ে দিয়েছে কপালে! উঃ সে কী রক্তারক্তি কাণ্ড! ননীর মা'র ভাইপো এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল! বাবা, মেয়েমানুষ এতোবড় দজ্জাল!

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলি—এ ত' তোমরা এক তরফাই শুনেছ? এমনও তো হ'তে পারে—গণেশবাবুই কোনো কু-মতলবে—

—আহা পারবে না কেন? হ'তে সবই পারে। ও মুখপোড়াকেও আমি ভাল বলি না, কিন্তু মনে রেখো ঘরটা ললিতবাবুদের নয়—গণেশবাবুর!

তা' বটে! কথাটা মিথ্যা নয়। মুখ্যু বলিয়া কি লজিক বোঝেন না বৌদি?

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া বলি—ধরা পড়ে কি করলো মেয়েটা?

—আ ছি ছি! তার কথা আর বলো না ভাই। প্রথমটা খুব তেজ দেখিয়ে 'বেশ করেছি', 'খুব করেছি', 'ছোটলোক চামার,' 'শয়তান'—এই সব চোটপাট করছিল, তারপর সে বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল, নড়লো না গো! এই লোকে

লোকারণ্য, দৃকপাত নেই। শেষে বাপ এসে প্রায় মারতে মারতে টেনে নিয়ে গেল !

পাশের ঘর হইতে দাদার কাশির আওয়াজ আসিতেছে।

ঠিক কাশি নয়—কাশির ভান! অর্থাৎ তিনি যে জাগিয়া আছেন এবং বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন সে সম্বন্ধে অবহিত করিয়া দেওয়া বৌদিকে।—

কার্য কারণের নিয়মানুসারে বৌদির উৎসাহদীপ্তি কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে। বাকি বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া সরিয়া পড়েন।

—ঘুমোও তুমি! বকবক ক'রে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করিয়ে দিলাম—ভদ্রতার এই কথাটুকু উচ্চারণ করিয়া তিনি তো যান, কিন্তু ঘুম সহজে আসিতে চায় না। বহুবার দেখিয়াছি ললিতবাবুর মেয়েকে....সিঁড়িতে ওঠানামা করিতে, দালানে বারান্দায়, কিন্তু কথা কহিতে দেখি নাই বড়ো একটা। ছোট করিয়া চুল কাটা, উদ্ধত ভঙ্গী, দীর্ঘাঙ্গী সেই মেয়েটাকে যতবারই মনে করিতে চেষ্টা করি—বৌদির বর্ণনার সঙ্গে মিলাইতে পারি না।

বৌদির অভিযোগটা কি সত্য হওয়া সম্ভব ?

চোরের মতো কুণ্ঠিত সন্তর্পিত ভাব কোথায় ?

কিন্তু—

নিজেই কি আমি কিছুদিন যাবৎ পকেটের ওজন সম্বন্ধে ধাঁধায় পড়িতেছি না ? অন্যমনস্ক প্রকৃতি বলিয়া একটা বদনাম আমার আছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এমন ঘন ঘন ঘটিতে সুরু করিয়াছে যে—আমার প্রকৃতিকেও নাড়া দিয়াছে।

অথচ আমার অজ্ঞাতসারে আমার পকেটের ওজন-হ্রাসের সংবাদ একবার বৌদির কানে উঠিলে বাড়ির ঝিটাকে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে এই আশঙ্কায় কথাটি কহি নাই।

তবে কি সরমাই ?...

এতো অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব ?

মনটায় যতোই অস্বস্তি থাক চুপচাপই থাকি।

দিন কাটে......

তেমনি খাটো চুল উড়াইয়া উদ্ধত মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি মেয়েটাকে, তেমনি মাঝে মাঝে পকেটের পয়সা গোলমাল হইতে থাকে। অথচ সাবধান হইবার উৎসাহ খুঁজিয়া পাই না।

হঠাৎ একদিন—

গণেশবাবুর মতো আমিও হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলাম!

লাস্ট শো-তে সিনেমা দেখিয়া ফিরিয়াছি—ঘরে ঢুকিয়া সুইচ্‌টা জ্বালিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!

খোলা স্যুটকেসের সামনে সরমা।

'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' কথার অর্থ এতো গভীরভাবে অনুভব করিয়াছি কবে ?

—আলো নিভোন, আলো নিভোন বলছি—

চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে হুকুমের সুর!

—আলো নিভাবো কেন ? —অনেক কষ্টে উচ্চারণ করি—পালাও তুমি। শিগ্‌গির পালাও!

—কেন পালাবো ?

কণ্ঠস্বর মুখের গড়নের মতই উদ্ধত।

বিরক্ত ভাবে বলি—পালাবে না তো কি গেলাস ছুঁড়ে মারবে ?

—ওঃ গণেশবাবুর খোঁটা দেওয়া হ'চ্ছে ? সে ছোটলোকটাকে বেশ করেছি মেরেছি। মারবোই তো। দরকার হ'লে থান ইঁট ছুঁড়েও মারতে পারি আমি তা জানেন ?

—জানলাম ! কিন্তু আমার সুটকেস নিয়ে তোমার কি দরকার জানতে পারলে ভালো হয় !

সত্য কথা বলিতে কি—খোলা সুটকেসের সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াও, মারাত্মক একটা চোর দেখিয়াছি এমন অনুভূতি আসে না।

সশব্দে ডালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া আসে সরমা। উগ্র স্বরে বলে—থাক্ থাক্, আর সুটকেসের বড়াই করতে হবে না। মিথ্যে খাটুনি সার ! ছাই আছে সুটকেসে, উনুনের পাঁশ আছে।

ভারি কৌতুক অনুভব করি।

চুরি করিতে আসিয়া এমন স্টেজ ফ্রী ! চুরির যোগ্য বস্তু নাই বলিয়া গৃহস্থকে ধিক্কার ! মজা মন্দ নয় !

হয় তো—চোর যদি ললিতবাবুর কন্যা না হইয়া পুত্র হইত, এমন কৌতুক বোধ করিতাম না। তরুণী নারীর মোহময় প্রভাব —অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কেউ দেখিয়া ফেলার আগে সরমাকে সরানো দরকার এ চৈতন্য থাকিলেও নিছক্ কথা কহিবার লোভেই কথা কই—এইমাত্র যে আমার ঘরে সিঁদ কাটিতে আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে হাসির কথা কহিতেও বাধে না। হাসিয়া বলি, সত্যি ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে বটে, উচিত ছিল সুটকেসে কিছু রেখে দেওয়া ; কি বলো ? কিন্তু এ কী বিশ্রী অভ্যাস তোমার ? না ব'লে ক'য়ে নেওয়া—

সরমা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—কেন হবে না বিশ্রী অভ্যাস? কেউ কি ইচ্ছে ক'রে দেবে এক পয়সা?

—বাঃ তাই বা দেবে কেন লোকে? শুধু শুধু কে কাকে দেয়?

সরমা আমার কথায় উত্তেজিত হইয়া ওঠে—জানি জানি কেউ কিছু দেয় না শুধু শুধু। তাহ'লে কি করবো আমরা শুনি? না খেয়ে মরবো?···বাবা ভাড়া দিতে পারে না ব'লে বাড়িওলার ছেলে কী যাচ্ছেতাই অপমান করছে রোজ, দেখতে পান না?

গম্ভীরভাবে বলি—সে তোমার বাবা বুঝবেন!

—'বাবা বুঝবেন'—আহা কী বুঝমান বাবা আমার—সরমা ভেংচাইয়া ওঠে—বাবার বোধশক্তি সব আছে যে! মদ খেয়ে পড়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা!

তীব্র উত্তর এবারে আমিই দিই—তাই বুঝি তুমি সুসন্তানের মতো উপার্জন ক'রে মদের পয়সা যোগান দাও? তা পথটা মন্দ নয়—খাটুনি নেই!

হঠাৎ যেন ফাটিয়া পড়ে সরমা—তাছাড়া আর কি করবো? আমি কি লেখাপড়া শিখেছি যে চাকরি ক'রে টাকা আনবো? ছোটলোক গণেশবাবুটা যা বলে তাই শুনলেই বুঝি ভালো হয় আপনাদের?

গণেশবাবু কি বলেন তা অবশ্য আমি জানি না, তবে অনুমান একটা করিয়াছিলাম। সেই রাত্রেই করিয়াছি।

নীরস গম্ভীরভাবে বলি—গণেশবাবু কি বলেন—তা জানবার সখ আমার নেই! তবে চুরি ক'রে বাপের মদের পয়সা যোগান দেওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। ওকে বীরত্ব বলে না।

—কে বলেছে বীরত্ব ? কে বলেছে বাহাদুরী ? —সরমা যেন মরীয়া হইয়া ওঠে —আপনি ভদ্দরলোক, এই বাড়ির মধ্যে সবাইয়ের থেকে ভালো আপনি, তবু এইরকম বলছেন ? তবু এমনি অবুঝ ? বুঝতে পারেন না—পয়সা না পেলে ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয় বাবা ! মারতে মারতে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় গণেশবাবুর ঘরে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বসিল মেয়েটা।

কথা শেষ করিবার আগেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল আমার পাতা বিছানাটার উপর !....

বুঝুন আমার অবস্থা !

টানিয়া তুলিবার উপায় নাই, অথচ কে কোনদিক হইতে দেখিবে তার ঠিক নাই, করি কি ?

কেবলমাত্র পয়সা চুরি করিবার জন্যই সরমা আমার ঘরে আসিয়াছে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ?

নিজেই সরিয়া পড়িব ?

কিন্তু কোন্ চুলোয় ?

দ্বিতীয় ঘরখানিতে অনেক আগেই খিল পড়িয়াছে। পথে বাহির হইবার উপায় নাই, গেটে তালা পড়িয়াছে !

শুধু বোকার মতো দাঁড়াইয়া থাকিব ?

বাধ্য হইয়াই বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া বলি —এই শুনছো— তুমি কিন্তু পালাও লক্ষ্মীটি ! ভারি বিশ্রী হচ্ছে এটা। এই নাও যা টাকা আছে আমার কাছে, নিয়ে চলে যাও, দোহাই তোমার !

—চাই না টাকা—ছাই টাকা ! কতো টাকা দেবেন আপনি ? কতো দিতে পারবেন ? ক'দিন চলবে ?

অপরাধীর মতোই নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করি।

—কিন্তু আমি আর কি করবো ?

—আপনিই সব পারেন ! আপনি আমায় এ দুর্গতি থেকে বাঁচান—দুটি পায়ে পড়ি আপনার। আর পারছি না আমি।

ওঠে না, মুখ তোলে না—উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়াই কথা কয়টা উচ্চারণ করে সরমা !

ক্রন্দনরতা তরুণীকে নিজের শয্যায় দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে !···চারিদিকের নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনায় গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। এখন আর —উদ্ধত বলিয়া বোধ হয় না, চোর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না !··· শোওয়ার ভঙ্গীটি কি মনোরম !

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদার দৃশ্যটি যেন উপভোগ করি·······অবাক হই···দেখিতে দেখিতে নেশা লাগে যেন।....

—ওঃ তাই বলি—এতো রাত্তিরে একলা একলা ঠাকুরপোর এতো কথা কেন ? তাই বলো ? একলা নয় 'দোকলা'।

পিঠের মধ্যে কেমন একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া গেল !

বৌদি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন ।

—তা' ভালো—সরমার আমাদের সব রকম চুরির বিদ্যেই জানা আছে দেখছি। কি বলো ঠাকুরপো ! নেহাত ছিঁচ্‌কে চোর নয়, এ্যাঁ ?

কথা কহিবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও স্বর বাহির হয় না।

বৌদি একাই একশ'—তিনিই কথা চালাইয়া যান—মহাপুরুষদেরও তাহ'লে মতিভ্রম হয় ? এ্যাঁ ? কিন্তু ছি ছি ঠাকুরপো,

ডুবলে ডুবলে—আঘাটায় ডুবতে গেলে?···যাক—দোরটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে মান-অভিমানের পালাটা সাঙ্গ করো ঠাকুরপো! পাঁচজনে দেখতে পেলে—তোমার না হো'ক আমাদের গায়ে ধূলো দেবে। যাই বাবা, তোমার দাদা আমাকে সুদ্ধু এ অবস্থায় দেখলে আর মুখ দেখবেন না আমার!

এই মুহূর্তেই বাঁচাইতে পারি সরমাকে!

রক্ষা করিতে পারি চরম অসম্মানের হাত হইতে···পরম দুর্গতির পথ হইতে। বৌদির সামনেই অনায়াস মহিমায় ওর মাথায় হাত রাখিয়া বলিতে পারি—'ওঠো সরমা লজ্জা কি? ভালোই হ'লো যে বৌদি জানলেন। এসো আমরা দুজনে একসঙ্গে ওঁর আশীর্বাদ চেয়ে নিই'—বলিবার মতো এমন ভালো ভালো কথা অনেক আছে বাংলা ভাষায়।

শরণার্থীকে রক্ষা করিতে মিথ্যা বলাও অশাস্ত্রীয় নয়—কিন্তু বলা কি এতো সোজা?

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দুর্বিপাকে এই ভেড়ার খোঁয়াড়ে আশ্রয় লইতে হইয়াছে বলিয়াই তো আর রক্তটা 'লাল হইয়া যায় নাই আমাদের? তাই ভালো ভালো কথার মোহ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিতে বৌদির পিছন পিছন বাহির হইয়া আসি। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বলি —তুমি কি ক্ষেপে গেলে বৌদি? ওটাকে আমি—

আগুন নিয়ে

নিত্য প্রথায় বাজার থেকে ফিরেই মাছ তরকারীর 'গলাকাটা দরের' সম্বন্ধে আলোচনার পরিবর্তে অমূল্যবাবু বললেন—দেখো গো, বাজারে হঠাৎ আমাদের সেই মধুপুরের শেখরবাবুর সঙ্গে দেখা হলো! ভদ্রলোক্ এই দিকেই কোথায় বাসা করেছেন।

মধুপুরের শেখরবাবু!

সুকুমারী দু'সেকেণ্ড ভেবে নিলেন। না, ভুলে তিনি যান নি! দীর্ঘকাল আগে জীবনে একবারই বিদেশে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন। সেখানে, সেই সামান্য ক'দিনে আর একটি চেঞ্জার পরিবারের সঙ্গে যে নিবিড় সখ্যতা জন্মেছিলো সেটা ভুলে যাবার কথা নয়।

ভুলে থাকলেও ভুলে যান নি।

আগ্রহ সহকারে বললেন—ওমা তাই নাকি? এতোদিন পরে হঠাৎ দেখে চিনতে পারলে?

—বাঃ, তা' পারবো না? সে আর ক'দিনের কথা!

—কমই বা কি? প্রায় ষোলো সতেরো বছর হলো! কি খবর সব?

—খবর—কিছুই ভালো নয়! ....অমূল্যবাবু গলার স্বরটা একটু ভারী, একটু বিষাদাচ্ছন্ন করে আনলেন—স্ত্রীটি সম্প্রতি গত হয়েছেন, ছেলেটা নতুন বিয়ে করেই বৌ নিয়ে আলাদা হয়েছে—আর—

' সুকুমারী কথার মাঝখানে 'হায় হায়' করে ওঠেন—এঁ্যা বৌটা মারা গেছে! আহা হা, আমি কোথায় এক্ষুনি ভাবছিলাম—একদিন দেখা করতে গেলে হয়!....মারা গেছে বৌটা!

ষোলো সতেরো বছর আগে যাকে একটি হাস্যমুখী বধূরূপে দেখেছিলেন সুকুমারী, সেটি নিজের সমবয়সী হলেও এখনকার গৃহিণীত্বের দৃষ্টিতে তা'কে নিতান্ত 'ছেলেমানুষ' বলে করুণা হয়। তার পরই পরবর্তী কথাটার ওপর লক্ষ্য পড়ে। বলেন—হ্যাঁ গা, সে ছেলেই বা কতো বড়ো হয়েছে যে, বৌ নিয়ে আলাদা হয়েছে?

অমূল্যবাবুর সম্প্রতি বিবাহিতা মেয়ে হিমানী জানালার ধারে বসে পান সাজছিলো, সে এইবার বাপমার কথায় ফোড়ন দিয়ে ওঠে—হবে না কেন মা? দাদার থেকে একটু বরং বড়োই ছিলো ছেলেটা! তোমার ছেলেটির এখনো বিয়ে দাওনি তাই, দিলে কি আর আলাদা না হতো এতোদিনে?

—খুব ওস্তাদ হয়েছিস যে—উক্ত 'দাদা' কি একটা কাজে ওপরে যেতে গিয়ে বাপের মুখে শেখরবাবু'র সংবাদে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলো,—বোনের কথার ওপর ঠোক্কর দিয়ে ওঠে—বিয়ে হয়ে সাহস বড্ডো বেড়ে গেছে কেমন?

—সাহসের কিছু নেই এতে, যা সত্যি তাই বলছি।...আর সেই মেয়েটা কতো বড়ো হয়েছে কিছু জিগ্যেস করলে বাবা? বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়? আমার মতনই ছিলো তো?...বাব্ বাঃ, কি মারটাই মারতো আমায়!

সুকুমারী একটু হেসে বলেন—সেই কথা মনে করে রেখে দিয়েছিস? ....মার খেয়ে মরতিস, তবু 'ভাবের'ও তো কম্‌তি ছিলো

না! সত্যি খুব হাসিখুসি ছিলো বটে মেয়েটা, কিন্তু—বেজায় দস্যি ছিলো! হ্যাঁ গো, মনে নেই তোমার, সেই চুল ঝুমঝুমিয়ে যখন তখন হুটপাট করে ছুটে আসতো, আর দৌরাত্মির চোটে অস্থির করে দিতো? অথচ ভালো না বেসেও পারা যেতো না!' ····কি যেন নাম ছিলো রে?

হিমানী বললে—মনে হচ্ছে যেন 'পিতু' 'পিতু' ব'লে ডাকতাম। প্রতিমা হবে বোধ হয়! জিগ্যেস করলে না কি বাবা তার কথা?

—জিগ্যেস করতে হয় নি—অমূল্যবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সামান্য থেমে বলেন—নিজে থেকেই বললে! উঃ!

ধীরে ধীরে খবর পরিবেশন করেন অমূল্যবাবু।

যে সংবাদে স্ত্রী শিউরে উঠবেন, মেয়ের মুখ শাদা হয়ে যাবে, ছেলে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবে, যে নিষ্ঠুর শোকাবহ ঘটনার কাছে হতভাগ্য শেখরবাবুর পত্নীর মৃত্যু বা পুত্রের অকৃতজ্ঞতার মতো দুঃখজনক ঘটনাও জোলো হয়ে যাবে, তেমন একটা শাঁসালো দুঃসংবাদ চট করে বলে ফেলবেনই বা কেন?

ঘোরালো করে গুছিয়ে গাছিয়ে না বললে, ঘটনার ভয়াবহতা কমে যাবে কি না কে বলতে পারে?

এই তো স্বভাব মানুষের!

'অমুকের ছেলেটি ভালো করে পাশ করেছে', এ খবর কে কা'কে বলে বেড়ায়? —'অমুকের ছেলেটা তো হয়ে গেলো'—এ খবর পরিচিত প্রত্যেককে না জানানো পর্যন্ত স্বস্তি থাকে?

অবশ্য তার সঙ্গে পরবর্তী অমুকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগটাই থাকে প্রধান লক্ষ্য!

অপরের দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি জানিয়ে আমরা যে সুখটা পাই,

অপরের সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করে কি তা'র শতাংশের একাংশও পাই ?

হতভাগ্য শেখরবাবুর নবপরিণীত জামাতা যদি ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টোপর মাথায় দিয়েই মারা গিয়ে থাকে, আর তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা কন্যা যদি দিব্য অক্ষতদেহে বেঁচে থাকে আজীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে, তবে সে কি একটা সোজা খবর ?

তার জন্যে প্রস্তুতি চাই না ? ধৈর্য চাই না ?

সব কিছু শোনার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, বাজারের তরি-তরকারীগুলো ঝুড়িতে গুছিয়ে তুলে রাখতে রাখতে সুকুমারী বলেন—মা মরে গেলো, ভাজ আলাদা হয়ে গেলো, শ্বশুরবাড়ি থেকে নিলোই না বলছো, মেয়েটার তা' হলে কি গতি হবে ? দেখবে কে ?

—দেখবে ভগবান ! ····শেখরবাবু অবিশ্যি এখন মনের খেদে যা তা' বলছেন, সে কি আর কাজের কথা ? মাথাটা বিগড়ে গেছে ভদ্রলোকের ! বাজারের মাঝখানে, আমার দুই হাত চেপে ধরে বলেন কি না—ঐ মেয়ের জন্যে আবার পাত্তর খুঁজে দিতে ! ছাড়াতে পারিনে, এমন মুস্কিল ! শেষ পর্যন্ত মিথ্যে স্তোক দিয়ে—

ধ্রুব তখনো বোধ করি সেই 'চুল ঝুম্‌ঝুম্‌' ছোট্ট মেয়েটাকে যথোপযুক্ত বড়ো করে বিধবার বেশটা পরিয়ে উঠতে পারছিলো না, স্তব্ধ হয়েই ছিলো। এইবার বাপের কথায় বলে —মিথ্যে কেন ? শেখরবাবুর কথাটা কি খুব অযৌক্তিক হয়েছে বাবা ? ও মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত নয় ?

অমূল্যবাবু গম্ভীর হাস্যে বলেন—একশো'বার উচিত ! তবে কথা হচ্ছে কি, আইবুড়ো মেয়ের জন্যেই পাত্র জোগাড় করে উঠতে

পারছে না লোকে, বিয়ে হচ্ছে না! বিধবা মেয়ের জন্যে পাবে কোথায়?

ধ্রুব তর্কের ঝোঁকে বলে—চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

—যেতে পারে! যদি মস্ত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে হয়, কিম্বা আগের স্বামীর দরুণ বেশ কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, তা' হলে পাওয়া অসম্ভব নয়।....গরীবের বিধবা মেয়ে? হুঁঃ!

এই 'হুঁঃ'টির ভিতর অনেক কিছুই ব্যক্ত হয়।

হিমানী ভালোমতো কিছু একটা বলবার ইচ্ছেয় বলে ওঠে—তা' হলেও বাবা, মনুষ্যত্বের দিক থেকে—

—আর থাম্ বাবা, এখনকার মানুষের কাছে আর 'মনুষ্যত্ব' আশা করিস নি, দে দিকি একটু তেল।

সুকুমারীই উঠে তেল আনতে যান, হিমানী ব্যস্তহাতে পান-গুলো মুড়তে থাকে, ধ্রুব ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়—আগে কেন যাচ্ছিলো মনে পড়ে না।....ওপরের দালানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় অমূল্যবাবুর শ্লেষাত্মক উষ্ণ মন্তব্য।....

উচিত! ঘরে ঘরে তালগাছপ্রমাণ আইবুড়ো মেয়েগুলো আধা-বিধবা হয়ে বসে রয়েছে, বিধবা মেয়ের জন্যে উচিত দেখাতে এসেছেন!

শ্লেষের কারণটা সুস্পষ্ট।

ধ্রুব একেবারে বিবাহে নারাজ!

নিজের তালগাছপ্রমাণ মেয়ের বিবাহে যে পরিমাণ চেষ্টা, খোসামোদ ও অর্থব্যয় করেছিলেন অমূল্যবাবু, তার কিছুটা উসুল করে নেবেন, এ আশায় ছাই দিচ্ছে ছেলে।

ক'দিন পরে, হঠাৎ একদিন বোনকে ডেকে ধ্রুব বলে ওঠে—খুব

তো তোরা ? আমি ভাবতাম মেয়েদের শরীরে বুঝি কিছু মায়া-মমতা আছে। ছি ছি!

হিমানী অবাক হয়ে বলে—হঠাৎ 'ছি ছি-ক্কার' দেবার মতো ভয়ঙ্কর মমতাহীনতা কি করলাম ?

—ভেবে দেখ্।

—বোঝা শক্ত! ভেবে হবে না। কি করেছি খুলে বলো শীগ্গির, দাদা!

—কতো করিস! আপাতত দেখ্না, এই যে শেখরবাবু পাড়ায় উঠে এসেছেন, বাল্যবন্ধুর ওরকম দুঃখের অবস্থা শুনলি, তা' কোন্ একবার দেখা করতে গেলি ?

হিমানী শিউরে উঠে বলে—রক্ষে করো বাবা! ও আমাকে কেটে ফেললেও হবে না! একে তো সেই কোন্ ছোটবেলায় দেখা, মনেই নেই ভালো করে, তার ওপর এখন এই অবস্থা! গিয়ে মুখ দেখাতেই পারব না।

—কি আশ্চর্য! এতে আর তোর লজ্জার কি আছে ? তুইতো আর ট্রেন-দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নস্ ? গিয়ে কি আর আহা উহু করবি ? যাবি, ছেলেবেলার গল্পটল্প করবি—

—না দাদা, সে অসম্ভব!

—অসম্ভব তো অসম্ভব! যাঃ! বেচারার মা'টা কেউ নেই, তাই বলছিলাম—

হিমানী এবারে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে—দেখো দাদা, একটু বুঝে সুঝে মায়া মমতা কোরো! তরুণী বিধবার ওপর বেশি দরদ, সন্দেহজনক।

—উচ্ছন্ন গেছিস একেবারে!

বলে চলে যায় ধ্রুব।

মেয়েগুলো কি এত ফাজিলও হয়!

কে জানে বিধবা হয়ে গেলে কেমন হয়ে যায় তারা! এক দিনের বিয়ের বিধবাও কি নিজেকে পৃথিবীর সমস্ত হাসি আনন্দ থেকে সরিয়ে নিয়ে 'সীল্' করে ফেলতে পারে? না কি ওটা চেষ্টাকৃত নয়—বিধাতার অমানুষিক দুর্ব্যবহারে আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষ?

মাথায় রিবন বাঁধা, পাতলা অর্গাণ্ডির ফ্রক পরা, উড়ন্ত পাখীর মত উদ্দাম সেই বছর ছয় সাতের মেয়েটা যে, কেমন করে বিধবা হয়ে যেতে পারে, এ কথা ধ্রুবর ধারণার বাইরে।

মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বলবে কি করে?

তা' কথাটা একদিন সুকুমারীই পাড়েন।

ছেলেকে ডেকে বলেন—ওঁকে বলে বলে তো এলে গেলাম, তুই একবার আমাকে নিয়ে চল না বাবা—? আহা, মেয়েটাকে একবার দেখে আসি। ওর মায়ের সঙ্গে কতো ভাব হয়েছিলো!

ধ্রুব বুঝতে পেরেও কেন কে জানে অজ্ঞতা দেখায়। যেন বোকার মত বলে—কোন্ মেয়েটা?

—আহা ওই শেখরবাবুর রে! সেদিন থেকে শুনে পর্যন্ত এতো 'ইয়ে' হচ্ছে! তা' উনি যদি কিছুতেই গা করছেন! অথচ নিত্যি বাজারে দেখা হচ্ছে ভদ্দরলোকের সঙ্গে।

ধ্রুব অবহেলা ভরে বলে—দিয়ে তোমায় আসতে পারি আমি। কিন্তু বাড়ি চিনবো কি করে? রাস্তার লোককে তো জিজ্ঞেস করে

বেড়াতে পারা যাবে না, 'সেই মেয়েটা কোন্ বাড়িতে থাকে গো মশাই ?'

সুকুমারী হেসে ফেলেন—তোর সব তা'তেই ঠাট্টা। উনি বলে দিয়েছেন। বাজার থেকে ডানহাতি বেরিয়ে যে রাস্তাটা গঙ্গার ঘাটের দিকে গেছে, সেই রাস্তার ওপরে, খানকতক বাড়ি বাদেই। লাল রঙের দোতলা বাড়ি। উনি একতলাটা ভাড়া নিয়েছেন।

হিমানী যদিও বলেছিল 'কেটে ফেললেও' যেতে পারবে না, তথাপি দেখা গেলো মায়ের সঙ্গে দিব্যি গুটিগুটি বেরিয়ে এলো যাবে বলে। দেখে শুনে একখানা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে। ···শোকের সামনে যাওয়া!

তা' সে সব বেশ কিছু দিন হয়েও গেল।

দিন চলে চক্রধারীর 'চক্রের' খাঁজে খাঁজে ধাক্কা খেতে খেতে!

সুকুমারী একদিন দেখে এসেই বিরক্ত হয়ে গেছেন। হিমানী, 'লাল ডুরে' পরা বিধবা দেখে এসে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে, বেছে বেছে একখানা সাদা শাড়ি পবে যাওয়ার জন্যে ; দু'একদিন চলেছে ওই আলোচনা, ব্যস অতঃপর খতম!

বিধবা মেয়েকে লালশাড়ি পবাবার অপরাধে হতভাগ্য শেখরবাবুও পুরানো দিনের বন্ধু-পরিবারের সহানুভূতি হারিয়েছেন।

অবিশ্যি আজ কালকার দিনে এই সব ধুতি-শাড়ি-থানের প্রশ্নটা প্রকাশ্যে ওঠানো চলে না, তা'হলে নিজেকে 'সেকেলে' বলে' প্রতিপন্ন করা হয়। কাজেই বিরক্তিটা অকারণের মতই দেখতে লাগে।

অথচ বিরক্ত না হয়েই বা উপায় কি ? যার দুঃখে বিগলিত দয়ার্দ্র চিত্তে সহানুভূতি দেখাতে ছুটলাম, সেই দুঃখিনী যদি দিব্য

শাড়ি গয়নায় সেজে হাস্যবদনে অভ্যর্থনা করতে ছুটে আসে, কার না বিরক্ত ধরে? 'আহা' করবার সুবিধেই যদি না পাওয়া গেল, গাড়ির ভাড়া দিয়ে সময় নষ্ট করে গিয়ে লাভ?

একটা চলতি কথা আছে—'বলা মুখ আর চলা পা'!

ও দুটো না কি একবার শুরু হলে বাড়তেই থাকে। ....ধ্রুবর একবারের 'চলা পা' রোজই তাই চলতে চায় 'বাজার থেকে ডানহাতি বেরিয়ে যাওয়া' রাস্তাটায়।....যেতে যেতে ঠিক থমকে দাঁড়ায় 'খানকতক বাড়ি বাদ একখানা লালরঙের দোতলার' সামনে!

যার একতলাটাতেই ওর প্রয়োজন!

লালবাড়ির একতলায় জাঁকিয়ে বসে চা খেতে খেতে ধ্রুব গম্ভীরভাবে বলে—মা বলেছেন 'ও মেয়েদের আবার বিয়ে হওয়াই উচিত!'

শুনে, 'ও মেয়ে' মুচকি হেসে বলে—হঠাৎ এ দণ্ডাদেশের কারণ?

—দণ্ডাদেশ কিসের? সুচিন্তিত মন্তব্য! মা বলেছেন 'ও হিঁদুয়ানীর ধার ধারে না, আচার আচরণ মানে না—'।

—অতএব আবার বিয়ে! কি বলো?

খিলখিল করে হেসে ওঠে পিতু।

—কেন, তোমার এতে আপত্তি আছে?—ধ্রুব বলে।

—হায় কপাল! আপত্তি! আজ পেলে কাল বলি না। কিন্তু করছে কে? আপত্তি তো পাত্র পক্ষে!

ধ্রুব গম্ভীর ভাবে বলে—ওটা তোমার ভুল ধারণা। এমন পাত্রও থাকতে পারে, যে সানন্দে রাজী হবে।

—ওঃ রাজী! পিতু মুখ টিপে হাসে—দেখি কতদিনে কপাল খোলে। আমি ত' বসে বসে আশা করছিলাম—মাসিমার যখন আমার দুঃখে প্রাণটা একেবারে চৌচির হয়ে ফেটে' গেছে তখন হয়তো বা ছেলের বৌ করেই ঘরে নিয়ে যান! হায় হায়, প্রস্তাব আর এলো না।

চমকে উঠল ধ্রুব।

আরক্ত মুখে বলে—সে প্রস্তাব যদি আর কোনখান থেকে আসে?

—যদি! ওঃ! ···কিন্তু চা'টা খেলে কই ধ্রুবদা? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

—যাক গে। তোমার বাবা কখন আসবেন বলো? কথা আছে।

—বাবা? বাবা তো ঘুমোচ্ছেন ওঘরে।

—ঘুমোচ্ছেন!

—হ্যাঁ, বাবার ওই রকম কাণ্ড! দুপুরবেলা-ভোর কি একখানা ছেঁড়া ইংরাজী বই নিয়ে অনুবাদ করবেন, আর তিনটে চারটের সময় ঘুমোতে শুরু করে সন্ধ্যা বেলায় উঠবেন!

—বারণ করো না?

—শুনছে কে? আর আর—দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় পিতুর মুখে, কথার জের টেনে বলে—জীবে দয়ার বশে তেমন জোরও করি না।

—তার মানে?

—মানে? মানে হচ্ছে—সুন্দরী তরুণী বিধবার সঙ্গে নির্জন আলাপে যে স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায়, তার কাঁচাপাকা দাড়ি-ওয়ালা আধাবুড়ো বাবা সামনে বসে থাকলে কি তেমন যায়?

—আঃ পিতু! কি অদ্ভুত রূঢ় কথাবার্তা তোমার! বেশ তুমি যদি না চাও, কাল থেকে আর আসবো না!

বলে থম্‌থমে মুখে উঠে দাঁড়ায় ধ্রুব।

পিতু একখানা চেয়ারে বসে পড়ে হতাশ ভঙ্গীতে দুই হাত উল্টে বলে—কি মুস্কিল! এর আবার রূঢ় হলো কোনখান্‌টায়? কেন, আমাকে কি সুন্দরী বলা চলে না? ···চুপ করে আছো যে? বলো? বলো না?

—চলে! চ'লে! হলো?

—আচ্ছা তরুণী? তাও অস্বীকার করতে পারো না। পারো? উহুঁ! বাকি থাকলো বিধবা! এটা নিশ্চয়ই বানানো কথা নয়? দেশে ধর্মে শাস্ত্রে আইনে কে না মানবে এ কথা? সবাই মানবে।

—আমি বাদে।—বলে দরজার বাইরে পা দেয় ধ্রুব।

—কাল আসছো তো?

—না।

—কি বিপদ! এসো এসো। ···বল তো বাবাকে আগে ঘুম ভাঙিয়ে এই মাঝখানে বসিয়ে রেখে দেব।

—বলেছি আমি তাই? নিজেই ভাঙছো নিজেই গড়ছো।

ধ্রুব ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে।

—আহা ধ্রুবদা, ভাঙ্গা গড়া নিয়েই তো জগৎ।····এই দেখো না, আমাকে একজন ভেঙে রেখে গেছে, আর একজন গড়বার ভার নিয়েছে।—মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে পিতু!

ও কি পাগল? না আগুন নিয়ে খেলে দেখতে চায়, কেমন লাগে!

আশ্চর্য! কিছু যদি বোঝবার উপায় আছে মেয়েটাকে!

বোঝা যায় না, আর যতো না বোঝা যায়, ততোই আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

রাত্রে মায়ে ঝিয়ে আহার কালে কথাটা পড়ে হিমানী।

—মা, তোমার চিরকুমারব্রতধারী পুত্তুরের যে ব্রত ভঙ্গ হচ্ছে গো?

সুকুমারী সচকিতে তাকিয়ে, সন্দিগ্ধভাবে বলেন—কেন কি হলো?

—হলো আর কি! নাটক-নভেলে যা হয়! দাদা তো পিতুকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে গেছে।

—ও আবার কি—অলক্ষুণে বিচ্ছিরি কথা!

সুকুমারী বিরক্ত ভাবে বলেন।

—বিচ্ছিরি সুচ্ছিরি বুঝি না মা! মোটকথা সত্যি! গোড়া থেকেই নাকি দয়া উথলে উঠেছিলো দাদার, এখন আর সেই দয়ার ফোয়ারা সামলাতে পারছে না। তাই শেখরবাবুকে বলে সব ঠিক করে বসে আছে।

—বটে!

রাগে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় আর কথা যোগায় না সুকুমারীর।

—আমার কিন্তু বাবা, সেই প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। তোমাদের সাধুপুরুষ ছেলে, শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে না, তাই সাহস করে বলিনি এত দিন! ভাবলাম, দেখি কতটা পাকে—

—খুব বুদ্ধির কাজ করেছো মা! বলি এখন তোমায় 'পাকা'র খবরটি দিয়ে গেলো কে?

হিমানী তড়বড় করে বলে ওঠে—কে আবার! যে পাকিয়েছে সে। এই তো এতোক্ষণ ঘণ্টাদুই ধরে তর্ক করে এলাম! একেবারে

স্থির সংকল্প! মরতে আমিই মরলাম আর কি! এ কাণ্ড হলে বাপের বাড়ি আসা জন্মের শোধ ঘুচে যাবে! যে দুর্দান্ত রাগী শ্বশুর আমার!

যার যা চিন্তা!

ধ্রুব মাকে বলে—কিন্তু তুমি এতো বিচলিত হচ্ছো কেন মা? ছেলের বিয়ে বিয়ে করে তো পাগল হয়ে যেতে।

—তা' বলে এই রকম বিয়ে! ছি ছি!

গিন্নি কর্তাকে বলেন—আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে! এ কী কেলেঙ্কারী।

কর্তা গিন্নীকে বলেন—কেন, যাও বেড়াতে? ছেলে সঙ্গে করে বাড়ি খুঁজে খুঁজে? চিরকেলে কথা—'ঘি আর আগুন'। আমি আর ওই ভয়ে ওদিক মাড়াতে সাহস করিনি! ভাবি বাজারে দেখা হয়, খবরাখবর হয়, সেই ভালো! তোমার যে আমার ওপর টেক্কা দিতে যাওয়া হলো? বাবুরা, বুক ফুলিয়ে গলাবাজী করেন 'বিয়ে করবো না'। একটা মেয়ে হাতের কাছে দেখলেই তো মুণ্ডু ঘুরে যায়। ....ছ্যা ছ্যা।

হিমানী বরকে বলে—দাদার কীর্তি শুনছো?

বর হিমানীকে বলে—শুনছি বৈ কি! শুনে মৃত্যুভয় কমে যাচ্ছে। প্রধান ভয় তো তোমাকে বিধবা করে যাবার? সে ভয় রইলো না। তোমার দাদার দৃষ্টান্ত সামনে থাকছে।

—বোলো না বোলো না—গলায় দড়ি!

শেখরবাবু ভাবী জামাতার হাত ধরে বলেন—তুমি আমাকে যে

কি মুক্তি দিচ্ছ বাবা! ওই হতভাগা মেয়েটার জন্যে মরে শান্তি পেতাম না আমি। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

ভাবী জামাতা নত বদনে বলে—ছি ছি, অতো ইয়ে করছেন কেন? এত আমারও সৌভাগ্য! পিতুর মতো মেয়ে যাদের ঘরে যাবে, তারা তো—ইয়ে—বর্তে যাবে।

যদিও কাদের ঘরে যাবে সেটা এখনো অনিশ্চিত।

অমূল্য সুকুমারী অনমনীয়।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতো উত্তেজনা, তার মনের কথাটি কি? কে জানে, সে বুদ্ধিসুদ্ধিওলা সত্যি একটা মানুষ, না পাগল?

শেখরবাবু যখন আনন্দে রুদ্ধ কণ্ঠ হয়ে মেয়ের কাছে ধ্রুবর গুণ-বর্ণনায় শতমুখ হয়ে বলেন—হ্যাঁ, ছেলের মতো ছেলে বটে একখানা! কী দরাজ প্রাণ! বাপ মা একেবারে বেঁকে বসে আছে, তবু সংকল্পে অটুট! তখন পিতু নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বলে—চুলগুলো কিন্তু বড্ডো খোঁচা খোঁচা বাবা। দেখলে এতো হাসি পায়!

শেখরবাবু অবাক হয়ে বলেন—অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান হৃদয়বান ছেলে! আর তা'র চুলগুলো খোঁচা খোঁচা বলে দেখে হাসি পায় তোর?

পিতু আরো অমায়িক ভাবে বলে—তা' কি করবো বাবা, বিদ্যে, বুদ্ধি, হৃদয়, কিছুই তো গায়ে লেখা থাকে না, দেখতেও পাওয়া যায় না। চুলগুলো যে বড্ড প্রমিনেণ্ট।

শেখরবাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—খবরদার পিতু, ওর সামনে যেন আর এ সব ঠাট্টা কোর না। তোমাকে বিশ্বাস নেই।

পিতুও গম্ভীর। বলে—সত্যি কথাকে যে তোমরা ঠাট্টা মনে করো কেন বাবা, তাও তো বুঝি না।

ধ্রুব কিন্তু যখন তখন উল্টো দোষ দেয়। বলে—তোমার ঠাট্টাগুলো ঠিক সত্যির মতো! শুনলে এক এক সময়ে ভয় হয়।

ভয় হবারই কথা।

কে জানে কেন, পিতুর নিজের একটুও ভয় হয় না! যা খুশি বলবার সাহস কোথায় পায় ও? খেয়ালী ছেলের দুরন্ত খেয়ালের বশে—হাতের দামী খেলনাটা আছড়ে ফেলার মতো, এ কী অদ্ভুত খেয়াল পিতুর! ওর ভাঙ্গা জীবনটা কতো ভাগ্যে আবার গড়ে উঠেছিলো, নিজে আছাড় মেরে ভাঙলো।

না কি আগুন নিয়ে খেলাই ওর শখ? যখন যে ভাবে পারে আগুন জ্বেলে বসে থাকে!

তা' নয়তো ধ্রুব আসতেই কি না বলে বসলো—শুনলাম তুমি নাকি আমাকে বিয়ে করবার জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠেছো? বাবার কাছে ঝুলোঝুলি করে মত আদায় পর্যন্ত হয়ে গেছে।

অনায়াসেই বলতে পারতো ধ্রুব—'বলেছিই তো! রেখেছো কেন ঝুলিয়ে?' কিন্তু বললো না। বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে বললো—এই কথা বলেছেন তোমার বাবা?

—আহা ভাষাটা কি আর নোটবুকে টুকে রেখেছি? ভাবটা সেই রকম মনে হলো।

ধ্রুব বিচলিতভাবে বলে—তোমার বাবাকে বেশ ভালোমানুষ বলেই মনে করতাম। ....ঝুলোঝুলি! একেবারে তো 'হাঁ' করেছিলেন, কথা তুলতেই যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। আর এখন

এই কথা! শুধু ওঁর মুখ চেয়েই আমি নিজের বাপ মার কাছে অপ্রিয় হয়েছি তা' জানো?

—ও মা সত্যি!—পিতু যেন আকাশ থেকে পড়েছে—হায় হায়! আমি ভেবে বসে আছি বুঝি আমার মুখ পানে চেয়ে দেখতে দেখতে সমাজ সংসার সব মিছে হয়ে গিয়েছে তোমার! দেখো দিকি, বাবার কি ভুল বোঝা! বুড়ো মানুষ! এক বুঝতে আর বুঝেছেন। যাক গে, তুমি মাসিমা মেসোমশাইকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করোগে!

—কি বলবো!—বোকার মত প্রশ্ন করে ধ্রুব।

—ওই যে গো—পিতু হেসে ওঠে—বোঝাবে সত্যি তো আর তুমি পাগল নও যে আমাকে বিয়ে করবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে। কতকগুলো বোকা নিয়েও আমার হয়েছে মহাজ্বালা। কথা বোঝে না, ঠাট্টা বোঝে না। নাও এখন এক পেয়ালা চা খেয়ে চলো দিকি আমার সঙ্গে দোকানে। বাবার সাশ্রয় করতে তো এই যাবৎ 'কনে পেঁটরা' আর 'গায়ে হলুদের ডালার' রঙ্‌চঙা শাড়িগুলো পরছি বসে বসে। এইবার শেষ হয়েছে। চলো দেখিগে, তরুণী বিধবার উপযুক্ত সৌখিন ধুতিটুতি কিছু মেলে কি না।

বাড়ি দেখে কমলার খুশির আর অন্ত নেই।

অশক্ত দুর্বল শরীর নিয়েও ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি করতে সুরু করে দেয়। 'দেখ দেখ কি চমৎকার চারিদিকে সিঁড়ি, দূর থেকে ঠিক যেন একটা রথের মত দেখতে লাগে। বারান্দার চালাটা কি নিচু গো? হাতে ছোঁওয়া যাচ্ছে যে—'

'আচ্ছা ইঁদারা আর কুয়োতে তফাৎ কি বলো তো? আমি বলেছি 'ইঁদারা' আর তোমার নতুন দাইটা হেসে মরে যাচ্ছে। আহা চিরকাল যদি এখানে থাকতে পেতাম···'

মনোজও হাসে ওর ছেলেমানুষিতে, বলে—'একমাস থাকলেই হয়তো কলকাতার জন্যে মন কেমন করবে। তখন অতিষ্ঠ করে তুলবে আমায়।'

'দেখো নিশ্চয় আমি মন টেঁকিয়ে থাকব—কলকাতার জন্যে আবার মন কেমন! ভারি তো কলকাতা। একটা বাড়িতে একশো জন লোক···হাঁফ্ ফেলবার জায়গা নেই।'

'বেশ, খুব হাঁফ্ ফেলো এখানে। কিন্তু বেশী দৌরাত্মি করে হাঁফিয়ে পড়ো না যেন লক্ষ্মীটি! এই এখ্খুনিই তুমি যা আরম্ভ করেছ।'

'বারে, তুমিই তো বলেছিলে এসব দেশে পা দিতে না দিতে গায়ে জোর হয়—তাই হচ্ছে।'

আবার ছুটে আসে, হেসে হেসে বলে—'যাই ভাগ্যিস টাইফয়েডে ভুগলাম, তাই না এত মজা হল? কি বল, হ্যাঁগো, তাই না?'

'হ্যাঁ গো তাই'—মনোজ ওকে একটু আদর করে নেয়—'তোমারি মজা, আর আমার সাজা এই আর কি। উঃ, তুমি তো ভুগলে টাইফয়েডে, আর আমি? আমার ভোগান্তি তোমার চেয়েও বেশী হয়েছে—কম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে?'

'ভয় হ'ত আমি মরে যাবো—না? কিন্তু মরলেই বা ক্ষতি কি ছিল?'

'ছিঃ! ওসব কথা বলতে নেই কমু, এসো, দেখিয়ে দাও কি ভাবে তোমার ঘরসংসার গুছিয়ে দেব। একটুও খাটতে পাবে না কিন্তু। ওই দাইটাকে দিয়ে সব করিয়ে নেবে, আর আমি তো একটি পুরাতন ভৃত্য আছিই। তোমার সমস্ত ফরমাস চালাবে এই ভৃত্যটির ওপর বুঝলে?'

'আহা কি কথাব ছিরি, ওই জন্যে দু'মাস ছুটি নেওয়া হয়েছে বুঝি?'

'না তো কি?'

'তবে এই নাও নতুন চাকরির প্রথম পাঠ—আমার খোকাটিকে একটু খাওয়ানোর দরকার—স্টোভটা জ্বালতে হবে।'

মনোজ স্টোভ জ্বালতে বসে।

কমলার কথার বিরাম নেই···বসলো এসে ম ।জের কাছে, বললে—'আচ্ছা সেই ষ্টোভ জ্বেলেই তো আমাদের একটু চা খেলে হয় না?'

'চা? দু'বার চা খায় না দুষ্টু মেয়ে। বরং তোমায় একটু গ্ল্যাক্‌সো করে দিই—'

'দায় পড়েছে আমার গ্ল্যাক্‌সো খেতে'—অভিমানে মুখ ভার করে কমলা বরের কোলের উপর শুয়ে পড়ে—'এখানেও বুঝি তুমি

আমায় রুগী বানিয়ে রাখবে ? ছাখো কি রকম সেরে গেছি আমি, ইচ্ছে করলেই এখন রান্না করে খাওয়াতে পারি তোমায়—'

'অত সুখে কাজ নেই আমার কমলরাণী, খেয়ে উপকার করলেই বেঁচে যাই।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। এর পর যখন খিদে খিদে করে অস্থির করবো—তখন বকবে হয়তো।'

'বকবোই তো, বকব না ? মারা উচিত তোমায়, ওই দাইটা দেখতে পাচ্ছে আর তুমি এরকম অসভ্যের মতন কোলে শুয়ে আছো ? ওঠো ওঠো—'

কমলা আরো নিবিড় করে নেয় নিজেকে।

'ভাববে আবার কি ? ভাববে এই কলকাতার সভ্যতা।'

'সভ্যতার নমুনাটা বেশ দেখাচ্ছো বটে। যাক্ গে—ধারণাটা ভালো করেই এগোক'—বলে মনোজ হেঁট হয়ে কমলার ছোট্ট কপালটির ওপর মুখ রাখে।

উঃ ! এই কমলাকে হারাতে বসেছিল সে। দীর্ঘ একচল্লিশ দিন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে, অবশেষে জয় হ'ল প্রেমের। হাড় ক'খানা যখন ফিরে পেয়েছে, আবার তা'তে আনবে নতুন রক্তের জোয়ার, ভরে দেবে সজীব প্রাণশক্তি। স্বাস্থ্যে লাবণ্যে টল্ টল্ কমলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে জয়লব্ধ ঐশ্বর্যের মত।

কমলাও আদরে আবদারে হয়েছে খুকীর মত, বেঁচে উঠে যেন মনোজকে কৃতার্থ করে দিয়েছে। তার উপর সংসারের সমস্ত বাধা বন্ধন থেকে দূরে এসে শুধু স্বামীটি সন্তানটি নিয়ে সংসার করার সুখ কি কম ?

এত সুখ রাখবে কোথায় কমলা ?

যদি না মুখর আনন্দে ঝলমল করবে—বালিকার মত হয়ে উঠবে অস্থির চপল!

যে বাড়ি নিয়ে আনন্দের সীমা নেই কমলার, কি বা অপূর্ব বাড়ি সেখানা?

মোটে দু'খানি ঘর। আর বাইরে ভিতরে দুদিকে খাপ্‌রার চাল দেওয়া নিচু নিচু বারান্দা। শান বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে দিব্যি খোলা 'কুয়োতলা'। কিন্তু খোলা হলেই বা ক্ষতি কি? আব্রুর প্রয়োজনও খুব নেই, কারণ বেশ কিছু দূরের মধ্যে এমন কোনো বাড়ি নেই, যাতে অপরের কৌতূহলের খোরাক হতে পারে কমলার স্বচ্ছন্দ জীবনলীলা।

প্রকাণ্ড একটা রুক্ষ মাঠ পার হয়ে যে ছোট গোছের সাঁওতালি বস্তিটা আছে, বলতে গেলে তারাই ভরসা, সেখান থেকেই একটা দাই জোগাড় করে এনেছে মনোজ।

খোকা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে—মনোজ ব্যস্ত হয়ে পেয়ালায় গরম জল রেখে চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে বিদেশের আমদানী দুগ্ধচূর্ণ,—মার কাছে শিশুর দাবী দাওয়া কিছু নেই, আগেও ছিল না—এখন তো থাকবেই না।

—'কেমন জব্দ? নিজে থেকে নিয়েছ চাকরি···এখন আর রাগ করতে পাবে না—খাওয়াও খোকনকে, আমি মজা দেখি বসে বসে।'

বসে বসে দেখবো বললেও বসে থাকতে পারে না, নেমে যায় উঠানে যেখানে কুয়োতলায় দাই কাপড় জামাগুলো কাচ্ছে।

—'দাই, ও দাই, কুয়ো থেকে জল তোল না দেখি'—

মনোজ কমলার কাণ্ড দেখে হাসবে না রাগ করবে ভেবে পাচ্ছে না, তবু ঈষৎ শাসনের সুরে ঘরের ভিতর থেকে ডাকে—'আচ্ছা কমলা কি হচ্ছে? দাইটা যে পাগল ভাববে তোমায়।'

—'ভাবুক গে। তুমি যে দাই কি ভাববে তাই ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছো?'

—…দাই, এই দাই, তোর নাম কিরে? ……'ঝুমরি'? ও মা ঝুমরি আবার নাম কিরে? ……

খোকনটা ভারি দামাল! হাঁটতে শেখেনি তবু হাঁটা চাই, বড় বড় মাথা আর মুখ, অথচ ছোট্ট ছোট্ট পা-ওয়ালা মানুষটাকে টলতে টলতে উঁচু রোয়াকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে না? কমলার মোটাসোটা ছেলেটিকে কোলে করা বারণ অত কি মনে থাকে? কোলে করে ঘরে আনতেই মনোজ চমকে উঠে, ছেলে কেড়ে নিয়ে বকতে সুরু করে দেয়,…'ছি ছি তোমাকে কি করে সামলাই বলতো কমলা? তুমি যে খোকনের চেয়েও দামাল হয়ে উঠছো? কি বলে ওকে কোলে তুলে নিয়ে এলে এতটা?'

—'আর ও পড়ে গেলে ভাল বুঝি?'

—'হ্যাঁ খুব ভালো, কেমন চমৎকার বুদ্ধি! ধরে রেখে আমায় ডাকতে পারতে।'

'বাঃ, আমি বুঝি আর কোন দিন সেরে উঠব না? দেখ দিকিন, কি রকম মোটা হয়ে উঠেছি? এই তো আগেকার ব্লাউসগুলো গায়ে আঁটছে না—দেখ না, দেখ—'

বলে ফরসা নিটোল হাতখানি এনে স্বামীর হাতের উপর তুলে ধরে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্বাস্থ্যের লাবণ্যে উজ্জ্বল সুপুষ্ট বাহুটিই স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

মনোজ একবার মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে। অসুখের সময় কেটে-ফেলা খাটো পাতলা চুলগুলি আগের মতই ঘন হয়ে এসেছে, পুরন্ত গালের পাশে দুলছে কোঁকড়ানো চারটি ঝুরো চুল।

এ যেন নতুন কমলা। বিধাতার সৃষ্ট নয়, মনোজের নিজের সৃষ্টি।

খোকন বোধ করি বাবার মুগ্ধদৃষ্টিটা একমাত্র মা'র মুখের উপরই নিবদ্ধ থাকা পছন্দ করছিল না। দু'হাতে বাবার মুখটা টানাটানি সুরু করে দেয়।

—বাব্‌বা বাব্‌বা বাব্‌বা....

ছেলেকে বুকের উপর চেপে ধরে আদরে ভরে দেয় মনোজ। —'হ্যাঁগো বাব্‌বা বাব্‌বা আমার নাকটা খাদ্যবস্তু নয় বুঝলে মশাই! ওই তোর মা'র নাকটা খেয়ে নে—খুব টিকলো, খুব মিষ্টি।'

—'হ্যাঁ, তুমি খেয়ে দেখেছ যে? রাগ ধরে। এখন থেকেই ছেলেকে কুশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একেই তো আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালোবাসে।'

মনোজ দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে—'আর তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো?'

—'আমি? সক্‌কলের চেয়ে ভালোবাসি—ওই গুঁফো গয়লাটাকে, ভোরবেলায় যে এসে 'বহুজী, দুধ' শব্দে পেটের পিলে চমকে দেয়।'

—'হায় ভগবান! আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা গুঁফো গয়লা! কপালে এও ছিল।'

সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নায় ধোওয়া উঠোনে বেঞ্চি পেতে বসে থাকে দুজনে। খোকন ঘুমিয়ে থাকে ঘরে। আবোল তাবোল অর্থহীন বকুনী কমলার···খোকন বড় হয়ে কি হবে····ডাক্তার? ব্যারিষ্টার? আই সি এস? কমলার ইচ্ছে খোকন দেশনেতা হয়···ফুলের মালা আর প্রশংসাভারে বিনম্র মানুষটি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে····আস্তে আস্তে ঘুচে যাবে ওর লজ্জার আড়াল, মুছে যাবে বিনয়ের আবরণ, জ্বলন্ত আগুনের মত উত্তপ্ত ভাষা অসংখ্য জনতাকে জাগিয়ে তুলবে—মাতিয়ে তুলবে···সাধারণ জনতার সঙ্গে মিশে কমলা দেখবে ছেলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত মুখ····শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হবে ওর গায়ে···চোখে আসবে অশ্রু।···পাশের লোক ভাববে সেন্টিমেণ্ট····ভাববে····বক্তৃতার অগ্নিস্রোতে লোহা গলতে সুরু করেছে···জানবে না কমলা কে! জানবে না ওই আশ্চর্য মানুষটি একদিন কমলার কোলে বসে 'আয় আয়' দিয়ে দিয়ে চাঁদ ডেকেছিল···আজও ঘরে ফিরে কোলের কাছে বসে বলবে—'খিদে পেয়েছে মা, বকে বকে গলা শুকিয়ে গেছে।'

মনোজ ধৈর্য ধরে' শোনে কমলার পাগলামি; কথা শেষ হলে হেসে উঠে বলে—'রক্ষা করো আমার এত সাধের খোকনকে বিলিয়ে দিতে চাই না আমি, আমাদের জিনিষ আমাদের থাক বাবা।'

—'তবে? তোমার কি ইচ্ছে?'

'আমার ইচ্ছে? বেশ মোটাসোটা ভুঁড়িওলা একটি ব্যবসাদার, পাটের নয়তো তিসির গুদোম আছে। পেরকাণ্ড বাড়ি, অগাধ টাকা ব্যাঙ্কে'—

—'যাও!' কমলা রেগে মুখ ফিরিয়ে বসে।

—'ব্যাঙ্কে টাকা থাকা'টা তা'হলে খারাপ? এই ধরো যদি

আমারই ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা থাকতো তা খুব খারাপ লাগতো তোমার ? বছরে দু'বার করে আসতাম চেঞ্জে, নিজেরই বাড়ি করে' রাখতাম ভালো ভালো জায়গায়, তিসির গোলাটা সহ্য করে নিতে পারতে না ?'

—'তোমার যত সব আজগুবি। দেশনেতা হলে বুঝি আর টাকা থাকতে নেই ?'

—'হ্যাঁ, দেশের লোকের মাথায় হাত বুলোতে পারলে 'আছে'— কিন্তু আমার মতে তার চেয়ে পাটের গুদামই ভালো। আমার ভাবী বৌমার দিকটাও তো ভাবতে হবে আমায় ? ছেলে তৈরি করে তোলা নিজেদের জন্যে নয় কমু ; সেই ভবিষ্যৎ অধিকারিনীর জন্যে।'

কথাটা কমলার পছন্দ নয়। খোকন একান্ত তার নিজস্ব। ওর কোনো ভাগীদার কখনো থাকবে এ কমলার অসহ্য।···তাই চাপা দিয়ে দেয় খোকনের ভবিষ্যৎ চিন্তা···বর্তমানের সুখস্রোতে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে।

সকাল বেলা মনোজ বেরিয়েছে—বেলা এগারোটা বাজে··· এখনো দেখা নেই, বেজায় চটে যাচ্ছে কমলা। আজকাল ও এবেলাটা রান্না করছে, 'ইক্‌মিক্‌ কুকার'কে ছুটি দেওয়া হয়েছে, কাজেই এতক্ষণ হাঁড়ি আগলে থাকতে ভালো লাগছে না। তেমনি কী দুষ্টুমি করছে খোকনটা ?···কেন যে সেই ভোর থেকে কান্না জুড়ে দিয়েছে ওই জানে···একফোঁটা দুধ খায়নি, অতীব প্রিয় 'বিকু' বা বিস্কুটের টুকরোটুকু পর্যন্ত মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, খায়নি।

মনোজ এলে বাঁচে কমলা।

আরো খানিক পরে মনোজ এলো। রোদে রাঙা মুখ, কেমন যেন আম্‌লে পড়ছে। কমলা অত লক্ষ্য করেনি....আসতে না আসতেই বকে ওঠে...'বেশ লোক তুমি!....কখন বেরিয়েছ আর এই এত বেলায় আসা? আমার বুঝি ভাল লাগে? খোকনটা আবার তেমনি জ্বালাতন করছে।'

গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে হাওয়ায় মেলে বসে পড়ে, খোকনকে কোলে টেনে নেয় মনোজ, বলে—'ভারি মা হয়েছেন, ছেলে সামলাতে পারেন না! আয় রে খোকন, আমরা বাপ বেটায় যুক্তি করে তোর মাকে জব্দ করি।....এই, এই, আবার নাক কামড়াবার চেষ্টা? আচ্ছা এত জিনিষ খেতে শিখছিস, তবু নাসিকা-ভক্ষণটি ছাড়তে পারছিস না? কী অসভ্য রে?'

—'হয়েছে ছেলের সোহাগ রাখো'—কমলা তোয়ালেখানা ছুঁড়ে দেয় স্বামীর গায়ে—'যাও চান করো গে—এত বেলা করলে কেন শুনি।'

—'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, মানে এখানকার ডাক্তার, বাড়িটা বেশী দূর নয় এখান থেকে, এতদিন দেখিনি এই আশ্চর্য। চমৎকার লোক, যদিও বেহারী, তবে বাঙলাও মন্দ বলেন না, তোমার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেব বলে একদিন নেমন্তন্ন করে এসেছি।'

—'হিন্দুস্থানীর সঙ্গে আবার ভাব!'

কমলা মুখ উল্টোয়।

—'আরে বাপু ডাক্তার মানুষের সঙ্গে ভাব একটু করাই ভালো —বিদেশে হঠাৎ যদি কিছু দরকার পড়ে —'

—'থাক্, আর ডাক্তারকে দরকার পড়ে কাজ নেই, এই দেড়

মাসের ওপর হয়ে গেল আসা হয়েছে. আর ক'দিনই বা থাকতে পাবো? খুব জোর দিন পনেরো ষোল। এর মধ্যে আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কি?'

মনোজ একটু মনোক্ষুন্ন হয়, ভদ্রলোককে সে বার বার বলেছে আসতে। বলে—'ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'একটা কথা বলা বা এক পেয়ালা চা করে দেওয়ার মধ্যে ঝামেলার কি আছে?'

—'তা কি বলছি? আমার কাছ থেকে তোমাকে খানিকক্ষণ কেড়ে নেবে তো? অনর্থক দুজনের মাঝখানে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি। আর ক'দিনই বা! কলকাতায় ফিরে গেলেই ত হয়ে গেল? সব সুখ ফুরোবে।'

—'ছি কমলা, অমন কথা মুখে আনতে নেই। সুখ জিনিসটা কি বাইরের ঘটনা? তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই বা কার আছে?····কিন্তু দেখ, খোকনের শরীরটা তেমন ভালো নেই বোধ হয়, গা-টা যেন গরম গরম লাগছে····ঘুমিয়েও পড়লো।'

স্নান করে এসে খেতে বসলো বটে কিন্তু খেতে ভালো করে সেও পারলো না।···শরীর মন দুই তেমন সুবিধে নেই। খোকনটার জ্বর হ'ল? এই এতদিন এসেছে, একদিনের জন্যে কিছু হয়নি, বরং জল হাওয়ার গুণে দিন দিন বেড়ে উঠছিল, রীতিমত ওজনে ভারী হয়ে গিয়েছিল ইদানীং।

মনটা মনোজের একটু মেয়েলী।

এই চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না····আজকেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আর আজই

জ্বর হ'ল খোকনের ? হয় তো বেড়ে উঠবে অসুখ···মারাত্মক কিছু হবে না তো ? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তো ?

কমলার মুখ থেকেই বা হঠাৎ অমন অশুভ কথাটা বেরোল কেন ? হে ভগবান ! ছোট প্রাণের ছোট সুখটুকু কেড়ে নিও না যেন।····

'তুমি যে কিছুই খেলে না ?'···কমলা দুধের বাটিটা পাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে—'পিত্তি পড়ে গেছে বোধ হয়—দেখ ভাত ভালো না লাগে দুধটুকু খাও শুধু।'

—'দুধও খাবো না, মোটে ইচ্ছে করছে না। শোনো, উনুনে আগুন আছে ?'

—'কেন ?'

—'একটু নুনজল করে দাও তো, কয়েকটা 'কুল্লি' করি, গলাটায় কেমন ব্যথা করে উঠলো।'

সন্ধ্যাবেলা আজও দুজনে উঠোনের বেঞ্চিতে বসেছিল, কিন্তু মুখরতা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। খোকনের জ্বর আর নিঃঝুম ভাবটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। অত অল্প জ্বরে অত নির্জীব হয়ে পড়েছে কেন ছেলে ? কাঁদছে তাও যেন দুর্বলভাবে, দুর্দান্ত দস্যি ছেলের দুষ্টুমিতে অস্থির হয়ে উঠতে হয়, কিন্তু এ ছেলে এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে থাকলেও তো ভালো লাগে না।···কেমন যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক প্রেতের মত ছায়া ফেলেছে মনের কাণায় কাণায়····তাড়াবার চেষ্টা করলেও যেতে চাইছে না! বাচ্ছা ছেলে, অসুখ বিসুখ তো করবেই···· একবারও অসুখে না ভুগে, ছেলে মানুষ করা যায় ?····এ যে মনোজের অন্যায় আবদার··তা ছাড়া সামান্য একটু জ্বরে এত

দুশ্চিন্তার কি আছে ? জোর করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে মনোজ।

কিন্তু দুশ্চিন্তাও তো ইচ্ছে করে করছে না সে···এমনি বসে থাকতে থাকতে সেই আতঙ্কের ছায়া মন থেকে সংক্রামিত হচ্ছে—পারিপার্শ্বিকতায়····ছড়িয়ে পড়ছে গাছেপাতায় সামনে পিছনে··· ম্লান জ্যোৎস্নায়-ছাওয়া বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে····দরমার ঘের-দেওয়া 'কুয়োতলার' ঘন অন্ধকার কোণটায়····দীর্ঘছায়া ফেলে কে যেন বসে আছে, কোথায় তার হিম শীতল নিশ্বাস আসন্ন শীতের শিহরণের সঙ্গে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠছে সর্বাঙ্গে।

মনোজ ভাবে····হয় তো ফিরে যাবার দিন নিকটবর্তী হয়ে আসছে বলেই এই অজ্ঞাত বিরহ। মনের মধ্যে আনাগোনা করছে একটা বিচ্ছেদের সুর····গুটিয়ে নিতে হবে 'তল্‌পি তল্‌পা'···ভেঙ্গে ফেলতে হবে সাজানো সংসার···করতে হবে যাত্রার আয়োজন।

যেতে হবে····যেতে হবে···পড়ে থাকবে এই ঘরদুয়ার বারান্দা তাদের অনেক সুখের স্মৃতি বুকে নিয়ে। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য জায়গায় খোকনের ছোট্ট হাতের ছাপ, তেলকালি আলতা সিঁদুর ভিজে উঠোনের কাদায়। 'পরের বাড়ি' বলে হিতোপদেশে সামলাতে পারা যায় নি তা'কে।

মলিন জ্যোৎস্নার চাদর বিছানো মূক প্রাঙ্গণ রহস্যময় আকাশের পানে মৌন দৃষ্টি মেলে নিঃশব্দে পড়ে থাকবে। মুখর হয়ে উঠবে না তাদের দুজনার প্রেমগুঞ্জনে, কমলার কলহাস্যে।

যাবার সময়—এই অনেকদিনের অনেক স্মৃতিমণ্ডিত বেঞ্চিখানা তুলে রেখে যেতে হবে ঘরে। তারপর ধীরে ধীরে এই বাড়ির চেহারা যাবে বদলে। বারান্দায়, ঘরের মেঝেয় পড়বে পুরু ধূলার আস্তরণ,

কিন্তু ক্রমশঃই সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। ডিপথিরিয়া কেস্। নিজেই অনুভব করেছে সে, একই দুর্দান্ত রোগ গ্রাস করতে এসেছে তাদের দুজনকে। কিন্তু আশ্চর্য! এত বড় মানুষটার এ কী ছেলে-মানুষী রোগ? শেষ কালে কি না খোকনের সঙ্গে মনোজের সুদ্ধ ডিপথিরিয়া! লোহার মত শরীর···অটুট স্বাস্থ্য····ভেঙে পড়লো এই ঘণ্টাকয়েকের আক্রমণে?

খোকন? ছোট্ট খোকন কতটুকু যুঝতে পারবে সে মৃত্যুর সঙ্গে? বিনা চিকিৎসার সঙ্গে?···ডাক্তার···ওষুধ···ইনজেকসান-সিরাম··· নানা চিন্তা ভীড় করছে ওর দুর্বল মস্তিষ্কে····কিন্তু বুজে আসছে গলা, কণ্ঠনালী চেপে ধরে কে যেন শ্বাসরোধ করে ফেলতে চায়! তবু জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চায় চৈতন্যের অবলুপ্তি···কে আনবে ডাক্তার, কে বাঁচাবে খোকনকে?···কমলাকে কে দেখবে তার নিজের মৃত্যু হ'লে?···প্রতিবেশীর কোলাহল সইবে না বলে কেন বাসা করেছিল লোকালয়ের বাইরে?····কমলার কি হবে?··· খোকনের কি হবে?···

বিকেলের দিকে ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই এলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড মানুষটি, হাসিখুশি মুখে খাদির টুপিটি মাথা থেকে খুলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে আটকে রেখে টুংটাং করে সাইকেলের বেল বাজাচ্ছেন···ভিতরের লোকের লক্ষ্য আকর্ষণের আশায়। হঠাৎ সাঁওতালি মেয়েটা বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা জানালো।

ভদ্রলোক প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন···তারপরই জেগে উঠলো ভিতরকার চিকিৎসক।·· দুটি রোগীকেই পরীক্ষা করে দেখলেন

নানাভাবে·· নাঃ, সন্দেহের কিছু নেই। ডিপ্‌থিরিয়া কেস····কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের এলাকার মধ্যে আছে কি এখনো ?····আর কোথায় বা সেই অমোঘ ঔষধ ? যুদ্ধের আগুনে বড় বড় সহর থেকে যে সব জিনিস বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেছে···সে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ কোথায় মিলবে এই অখ্যাত গ্রামে ? সংগ্রহ করবার চেষ্টাই বা করবে কে ?

হায় ঈশ্বর, এমন বিপজ্জনক অবস্থাতেও মানুষ পড়ে ?

কিন্তু সত্যিই সুস্থ হাত পা থাকতে—দুটো দুটো মানুষকে মরতে দেখা যায় না বসে বসে! করতেই হবে কিছু···কোনো আশা না থাকলেও অসম্ভবের আশায় ছুটোছুটি করতে হবে, নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া যা হয় কিছু করা।

'আপনি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবেন ?'

'আপনি চলে যাবেন ?'···কমলা যেন শিউরে ওঠে। ডাক্তার আসার পরে ডাক্তারের হতাশ মুখ দেখে সে রোগের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে····তবু ডাক্তার আছেন। অনেকটা বুকের বল। একটা কিছু উপায় হবেই····চাঙ্গা হয়ে উঠবে খোকন আর মনোজ, হয়তো একটু পরেই ক্ষীণ কণ্ঠে আদেশ করবে····'ডাক্তারবাবুকে একটু চা করে দাও না।'····খোকন তার মোমের মত ছোট্ট হাত পা নেড়ে খুদে খুদে দাঁতে হাসবে আর ডাকবে, 'মাম্ মা মাঃ।'

কিন্তু কই ? এ যে ক্রমেই নীল হয়ে আসছে।····এ কী সন্ধ্যার ছায়া ? না তার ভয়ার্ত মনের ভ্রম ? দেবদূতের মত—ডাক্তারের হঠাৎ আবির্ভাবে যে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল, সে-বিশ্বাসের মূল ক্রমশঃই শিথিল হয়ে আসছে কেন ?···তাই ব্যাকুল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো····'আপনি চলে যাবেন না ডাক্তারবাবু।'

'সিরামের খোঁজ করতে হবে যে···অবশ্য পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত।'

'ডাক্তারবাবু! ওরা····তুজনেই····?' কমলার উদ্যত কান্নাকে প্রায় ধমকের চোটেই বন্ধ করে দেন ডাক্তার,—'চুপ করুন, থামুন, অস্থির হবার সময় নয় এটা। মনকে তো কঠিন করতেই হবে · টেলিগ্রাম করবার দরকার আছে। যদি বলেন—'

টেলিগ্রাম? ··টেলিগ্রাম তো করতেই হবে! কী আশ্চর্য! এতক্ষণ মনেই পড়েনি একথা! মনোজের মা-বাপ ভাই-বোন কোথায় তারা সব? তাদের কাছ থেকে যে একলা কমলা নিয়ে এসেছে তাকে, সে কি অনধিকার-চর্চা নয়?···এরপর জবাবদিহি দেবে কি?—'হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিন····এই যে ঠিকানা আর টাকা··· অনেক ধন্যবাদ আপনাকে—'

'ধন্যবাদের সময় আসেনি এখনো, সাবধানে থাকবেন, লক্ষ্য রাখবেন উভয়ের উপর'—ডাক্তার সাইকেল নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যান।

বিকেল গড়িয়ে নামলো সন্ধ্যা····তারপর ভয়াবহ রাত্রি···মাঝে মাঝে অসহায় শিশুর অস্ফুট কাতরোক্তি আর মনোজের অস্বচ্ছন্দ নিশ্বাস পতনের ভারী শব্দ ছাড়া টুঁ শব্দ নেই। বাচাল সাঁওতালী মেয়েটা পর্যন্ত স্তব্ধ গম্ভীর মুখে অবিরাম পাখা চালাচ্ছে।····কিন্তু কোথায় ডাক্তার? কে আনবে মৃতসঞ্জীবনী?

প্রায় নটায় সময় আবার বেজে উঠলো সাইকেলের বেল্।

ডাক্তার এসেছেন।

'মাত্র একজনকে বাঁচানো যাবে'—বাঙলা ভাষা বটে তবে উচ্চারণের ভঙ্গীতে বেহারী 'টান' স্পষ্ট। কমলা কি শুনতে কিছু ভুল করেছে? কি বলছে ডাক্তার?....'ওষুধ পাওয়া যায়নি?'.... প্রশ্ন নয় একটা আর্তনাদ।

'পাওয়া গেছে, আবশ্যকের উপযুক্ত নয়। মাত্র একজনকে দেওয়া যাবে।'

ডাক্তার ইনজেক্‌শনের জোগাড় করতে থাকেন।...হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু সময় যেন কমলাকে বিবেচনা করবার সময় দিতে।

'আমার শেষ শক্তি পর্যন্ত ব্যয় করেছি'—

'তা'হলে কি হবে?'

শুধু এইটুকুই বলতে পারে কমলা।

'একজনের জন্যে শেষ চেষ্টা দেখতে হবে—বলুন কাকে দেব?'

এ আবার কি অসম্ভব প্রশ্ন? এর উত্তর দিতে হবে কমলাকে? যে-কমলা খাটো চুল দুলিয়ে হেসে খেলে গান গেয়ে বেড়ায়? মিনিটে মিনিটে মনোজের ওপর অভিমান করে?.. এটা কি সত্যই একটা প্রশ্ন?...এটা কি বাংলা ভাষা?

'দেখুন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে—মিথ্যে দেরী করে লাভ কি? মিষ্টার চৌধুরীকেই দেওয়া যাক?'

'আর খোকা?'

যেন মৃতের কণ্ঠ থেকে একটা অসাড় শব্দ বেরিয়ে এল।

'কিন্তু দুজনের মত যে নেই।'—ডাক্তার হতাশভাবে মাথা নাড়েন। 'একজনের আশা ছাড়তেই হবে।'

কমলা কি জড় পদার্থ ? কথার উত্তর দিতে পারছে না কেন ? আঙুলটি পর্যন্ত নাড়বার ক্ষমতা চলে গেছে যে।

ডাক্তার সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যান মনোজের কাছে।....সাঁওতালি মেয়েটা তৎপর হয়ে উঠেছে।....কমলার কোলে খোকন · এতক্ষণ গেঙিয়ে গেঙিয়ে এইবার চুপ করে গেছে...শুধু খোলা হাওয়া.... বুক ভরা একটু নিশ্বাস নেবার জন্যে একটা মর্মন্তুদ আকূতি।... কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে এই নিষ্ফল চেষ্টা।....থেমে যাবে শেষ স্পন্দনটুকু, মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়েও আটকাতে পারবে না কমলা। খোকন...খোকন...লুপ্ত হয়ে যাবে এই নাম—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে এই ছোট্ট ফুলটি !

'ডাক্তারবাবু'—কমলা খোকনকে কোল থেকে নামিয়ে উন্মাদের মত ছুটে এসে ডাক্তারের হাত চেপে ধরলো।

কিন্তু মনোজ তো সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায়নি ! শুধু কথা কইবার ক্ষমতা নেই বলেই চুপ করে আছে।

'আপনি কি উন্মাদ হয়ে গেলেন মিসেস চৌধুরী, হাত ছাড়ুন, আমার কর্তব্য করতে দিন আমাকে।'

'আর খোকন ? এই অসহায় শিশুটিকে বাঁচানো আপনার কর্তব্য নয় ডাক্তারবাবু ?'

'হায় ঈশ্বর ! দেখতে পাচ্ছেন আমি নিরুপায়।'

'আমার মেরে ফেলুন ডাক্তারবাবু দয়া করুন আমায়।'

সিরিঞ্জটা নামিয়ে রেখে কমলার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডাক্তার হতাশভঙ্গীতে চেয়ারের পিঠে নিজেকে এলিয়ে দেন।—হায় ভগবান ! এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় কোনো

চিকিৎসককে কখনো পড়তে হয়েছে ? কি প্রয়োজন ছিল ডাক্তারের আজই বেড়াতে আসার ?'

'আপনি তাহলে শিশুটিকে বাঁচাতে চান ?'

গম্ভীর প্রশ্ন করেন ডাক্তার।

হঠাৎ সাঁওতালি মেয়েটা অবোধ্য ভাষায় তীব্র চীৎকার করে ওঠে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার সে বুঝতে চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। বাঙলা বলতে হয়তো পারে সে, কিন্তু এখন উত্তেজিত আবেগে যা বললো সেটা সম্পূর্ণ দেশজ ভাষা।

ডাক্তার খাড়া হয়ে বসে কমলাকে উদ্দেশ' করে বললেন—'ও কি বলতে চাচ্ছে জানেন ? বলছে....সন্তান হারালে আবার সন্তানের আশা আছে—কিন্তু স্বামী হারালে ?—আর দেরী করতে পারছি না আমি, আপনি পাশের ঘরে চলে যান, ভগবানের উপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে।'

'খোকনকে বাঁচান ডাক্তার বাবু।'

'আমি একজন পাগলের কথা শুনতে রাজী নই।' ডাক্তার দৃঢ় ভাবে প্রস্তুত করে নেন নিজেকে···'এক্ষেত্রে প্রাণের মূল্য বিচার করা ছাড়া উপায় নেই, মিষ্টার চৌধুরীকে আমি অনেক বেশী মূল্যবান মনে করছি।' মনোজের কাছে যেতেই সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মনোজ ডাক্তারের হাতটা সরিয়ে দিলে....খোকন—খোকনই ভোগ করুক পৃথিবীর আলো বাতাস···নূতন দিনের সূর্য।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে....ছোট্ট বাচ্চাটির কাছে হেঁট হয়ে বসলেন—'বেশ আপনাদের যা ইচ্ছা। অনেক লেট হয়ে গেছে, কাজ হবে কিনা কিছুই বলা যায় না। এখনো বিবেচনা করুন আপনি কাকে চান ? আপনার হাজব্যাণ্ডকে না এই বাচ্চাকে ?'

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে কি দিতে হয়েছে এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর? কাকে সে চায়—স্বামী না সন্তান? কে তার কাছে অধিকতর মূল্যবান?

'ভেবে দেখুন আপনার ভবিষ্যতের অসহায় অবস্থা। এই বাচ্চাটি রক্ষা করতে পারবে আপনাকে? হয়তো এও মারা যাবে, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা এর মধ্যে কতটুকু?'

হায়! হায়! ক্ষমতা নেই বলেই না কমলার সমস্ত হৃদয় বিগলিত স্নেহে ওকে রক্ষা করতে চাইছে।

নিজের প্রয়োজনের মূল্যটাই সবচেয়ে বড়?

...'আপনি একেই দিন।'

কমলার স্বরটা কিছু স্বাভাবিক শোনালো,...মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে হয় তো।

'বেশ। আমার বিবেকের বিরুদ্ধেই যেতে হচ্ছে আমাকে।'

এতটুকু একটু শিশু, ও তো ডাক্তারের কাছে একটা মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছু নয়।...প্রায় অধৈর্য হয়েই ডাক্তার চটপট দিয়ে ফেলেন ইন্‌জেকসান। সাঁওতালি মেয়েটা দুই চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বেলে তাকিয়ে আছে সেই অসহায় মাংসপিণ্ডটার পানে।

পাখার বাতাস করতেও আর মনে নেই ওর।

রাত্রে ডাক্তারকে থাকতেই হবে, ঘণ্টাকয়েক পরে আবার একবার চালাতে হবে যমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান। কিন্তু কে হার মানবে! মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে...ঘর থেকে বাইরে... উঠান থেকে বারান্দায়। 'খস্ খস্ হিস্ হিস্' সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। সমস্ত শিরায় শিরায় জীবন্ত প্রাণী কয়টির চলমান রক্ত-স্রোতও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সেই শব্দে।

দেয়ালের গায়ে দীর্ঘ ছায়া···মৃত্যুর দূত অপেক্ষা করছে সময়ের, সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে প্রভুর অনির্বাণ ক্ষুধার আহুতি।···রাত্রি কত দীর্ঘ! যুগযুগান্তর ধরে যেন এই রাত্রি নেমেছে পৃথিবীর বুকে··· চেপে বসে আছে বিরাট পাহাড়ের মত। এ রাত্রির শেষ নেই।

কিন্তু কমলার কি সত্যই মাথা খারাপ হয়ে গেল?

দ্বিতীয়বার ইনজেকশনের জন্য প্রস্তুত ডাক্তারের হাত চেপে ধরেছে কেন আবার?

'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু আমায় ক্ষমা করুন, এঁকে দেখুন, বাঁচিয়ে দিন আমার স্বামীকে—আপনার পায়ে পড়ছি ডাক্তারবাবু রক্ষা করুন আমার স্বামীকে, আমার স্বামীকে, ছেলে চাই না আমি —ওকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিন।'

'পাগলের প্রলাপ শোনবার জন্যে এখানে আসিনি।—এই এঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যা।'

বিরক্ত হয়েই ডাক্তার সাঁওতালি মেয়েটাকে হুকুম করেন।

আশ্চর্য! কমলা আস্তে আস্তে উঠে ওর সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল।···

আশ্চর্য, সবটাই আশ্চর্য! সারা মন হাতড়ে খোকনের জন্যে আর একবিন্দু সহানুভূতি খুঁজে পাচ্ছে না সে। বাসিফুলের মত ওই বিবর্ণ মাংসপিণ্ডটুকুর জন্যে কি হারিয়ে ফেললো কমলা? কতখানি ঐশ্বর্য!···মনোজ ছাড়া কমলা কে? কী তার মূল্য? কোথায় তার সত্তা? সমাজের কাছে কি সংসারের সমস্ত পৃথিবীর কাছে কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবে মনোজকে হারিয়ে?···আর মনোজের মা বাপ ভাই বোন? তাদের কি বলবে? খোকন? সে তো কেবল মাত্র কমলার একান্তই, তার নিজের! আর মনোজ? মনোজ যে

সকলের, সারা জগতের। কোন্ অধিকারে কমলা নষ্ট করতে বসেছে সেই সকলের সম্পত্তি ?

কমলা কি করলো ?···কমলা কি করবে ?

কমলা কেন পাগল হয়ে যাচ্ছে না ?···কেন হার্টফেল করছে না ?

দুরন্ত টাইফয়েড জ্বরে কমলা মরেনি কেন ?···

সকালবেলা আর একবার মৃত সঞ্জীবনীর শেষ বিন্দুটুকু খোকনের দেহে সঞ্চারিত করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার—বললেন···'একে সাবধানে রাখুন, শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখবেন ভাল করে। বেঁচে যাবে আপনার ছেলে।···আর ওঁর জন্য—চরম চেষ্টা দেখবো আমি, অপারেশন করে যদি কোনো ফল পাওয়া যায়।···বাট্ ইট ইজ টু-লেট।'

যন্ত্রপাতি এবং আর একজন সাহায্যকারীর জন্য ডাক্তার আবার সাইকেল চেপে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। রাত্রে গেলে কোন লাভ হ'ত না, কারণ কম্পাউণ্ডার 'সুখন' সাতটার সময় এসে ডিস্পেনসারি খোলে সাতমাইল রাস্তা ভেঙে। আরো 'দেহাতে' তার বাড়ি।

ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে খোকনের, বিষে আচ্ছন্ন শরীর সজীব হয়ে উঠছে···হালকা হয়ে আসছে ভারী ভারী চোখের পাতা নতুন সূর্যের আলো দেখবার আশায়।···ভাবী-কালের মানব পৃথিবীর কাছে তার দাবী জানাচ্ছে।···

'ই-ইরে···মাইজী,···বাবু মরগেই'···সাঁওতালি মেয়েটা বন্যজন্তুর মত বীভৎস চীৎকার করে ওঠে···

'মরগেই'? 'মরগেই' মানে কি? সত্যিই মরে গেল নাকি মনোজ?

হুড়মুড় করে ছুটে এসেছে কমলা মনোজের বিছানার পাশে··· খোকনের মাথার বালিশ স্থানচ্যুত হয়ে গেল ওর পায়ের ধাক্কায়··· ফুল লতা কাটা ভারী কাঁথাখানা কমলার কোল থেকে কোথায় ছিটকে পড়লো কে জানে।···

মনোজ মারা গেছে। চরম চেষ্টার আগেই চরমপত্র পেয়ে গেছে সে বিধাতার দরবারে।···এখন এই প্রাণহীন দেহটা নিয়ে কি করবে করুক কমলা। চৌকীর কোণে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হলেও কি এক ফোঁটা করুণা পাবে মনোজের?···'কী ছেলেমানুষী করেছো কমু' বলে একটা হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে কাছে?···· কমলার অবিশ্বাস্য দুর্ব্যবহারে যেন পাথর হয়ে গেছে মনোজ।

কিন্তু খোকনই বা পাথর হয়ে গেল কেন?···কমলাই শুধু পাথর হয়ে যাবে না?···বেড়াবে রক্ত-মাংসের বোঝা নিয়ে?

বাইরে থেকে বুঝে এসেছিলেন ডাক্তার, কমলার তীব্র চীৎকারে তবু যন্ত্রচালিতের মত ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন,—বোধ করি নিশ্চিত বুঝে নিতে।····নাঃ, সন্দেহের কিছু নেই···শেষ বারের মত পৃথিবীর অফুরন্ত বায়ুপ্রবাহের এক কণার জন্য কাড়াকাড়ি করতে করতে হেরে গিয়ে পরাজিত মনোজ চৌধুরী যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে তার নিষ্ঠুর কৃপণতার দিকে।

কিন্তু কাঁথা চাপা দেওয়া ওটা কি পড়ে?

'হা ঈশ্বর! বাচ্চাটির এ অবস্থা কে করলো?' ডাক্তার হেঁট হয়ে তুলে নিলেন ছেলেটিকে।···কিন্তু বেঁচে থাকা তো আর সম্ভব

ময় ?···মুমূর্ষু শিশু অতক্ষণ ধরে মুখের উপর ভারী কাঁথাটার ভার সইবে কি করে ? ·এই সামান্য আবরণটুকুই তাকে বঞ্চিত করেছে সেই অফুরন্ত বায়ুপ্রবাহ থেকে। হেরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে নেই—বিনীত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে চোখদু'টি মুদে আছে।

ব্যাঙ্ক ফেল

দক্ষিণ কলিকাতার বিরাট অজগর-দেহ যথেষ্ট অগ্রসর হতে হতে যেখানে এসে বিশ্রাম নিয়েছে—বিকৃতরুচি গ্রাম্যরূপ, আর উদ্ধত আধুনিকতার বেখাপ্পা মিশেলের মাঝখানে—সেইখানে অনেকটা জায়গা দখল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মজুমদার সাহেবের প্রকাণ্ড বাড়িখানা!

ওপাশে পচা বাঁশের গুদাম আর এপাশে একটা দুঃস্থ মুদিখানা।

এই দুটি প্রতিবেশীর মাঝখানে—অতি আধুনিক পদ্ধতির নমুনায় সমৃদ্ধ এই বাড়িখানা, যেন একটা অনাসৃষ্টি ব্যতিক্রম! তবে—বেশীদিন এই অবস্থা থাকবে না এই ভরসা।

এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো আছে যতো টুকরো টাকরা জমি, সবাইয়ের বুকের উপরই অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে ওর সগোত্রদের, অজগর বিশ্রাম ছেড়ে আবার এগোতে শুরু করবে!

ভাগ্যদেবীর বরপুত্ররা শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে জীবনের রস আহরণ করে নিয়ে এদিকে আশ্রয় নিতে আসেন, সে রসকে উপভোগ করতে। এখানে শহরের সুখসুবিধা ষোল আনা আদায় করেও নিশ্বাস ফেলতে হাওয়া মেলে।

সরকারী এঞ্জিনীয়ার ডি মজুমদার বেছে নিয়েছেন এই জায়গাকে, বাসা বাঁধতে।

পড়ন্ত বেলা। পশ্চিম আকাশে এখনো বর্ণের সমারোহ!

বাড়ির সামনে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ইতস্ততঃ তাকাচ্ছিল উপর দিকে। ছাতে বারান্দায় জানালায় যদি দেখা মেলে কারুর। কিন্তু না, কেউ নেই।

বাড়ির তুলনায় বাসিন্দার সংখ্যা নেহাৎই নগণ্য, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো লোক কোথায়? মিস্টার, মিসেস, আর বছর ছয়েকের একটা মেয়ে। এই—

প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকরবাকর আছে বলেই বোধ করি এতো বড়ো বাড়িতে বাস করা সম্ভব হয়েছে।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে ঢুকে পড়লো মেয়েটি গেট ঠেলে।

অগত্যাই কলিং বেল্ টিপে জানাতে হবে নিজের আগমন সংবাদ। মেয়েটির আঁটসাট পাতলা ঝরঝরে চেহারা থেকে বয়েস ধরে ফেলা শক্ত। সাতাশ হওয়া বিচিত্র নয়, উনিশ হওয়াও অসম্ভব নয়।

তবে পরণের পরিচ্ছদ প্রায় দুঃস্থ।

এবাড়ির আত্মীয়-গোষ্ঠীর কেউ নয় সে, এক নজরেই বোঝা যায়। হয়তো—সাহায্যপ্রার্থিনী, হয়তো কর্মপ্রার্থিনী।…গায়ে সাধারণ একটা পাতলা ছিটের ব্লাউসের ওপর ঘুরিয়ে পরা একখানা সরু কালাপাড় শাদাশাড়ি, হাতে মাত্র দু'গাছি করে চুড়ি। আর কোথাও নেই বাহুল্যভার।

শুধু নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় চশমার জাতটা কুলীন। বোধকরি ওই জিনিষটাতেই ওর যা কিছু সখ।

বেল্ টিপতেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা চাকর।

কিছু জিগ্যেস করলে না, শুধু আপাদমস্তক দেখে নিলে

একবার। দেখে নিলো—সসম্ভ্রমে আহ্বান করে বসাবার প্রয়োজন আছে কি না।

নাঃ। গাড়ি করে আসেনি।

গেটের বাইরে গাড়ির একখানা চাকাও নেই। পায়ে হেঁটে এলে, পায়ের ওপরই দাঁড় করিয়ে রাখা চলে তাদের। তার বেশী কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি নিঃশব্দে হাতের ব্যাগটা খুলে চাকরটার হাতে তুলে দিলো একটা খবরের কাগজের কাটিং। কর্মখালির বিজ্ঞাপন।

আজকের কাগজেই প্রথম বেরিয়েছে।

কন্যার জন্য শিক্ষয়িত্রী চেয়েছেন মজুমদার সাহেব।

কাটিংটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে মিনিটখানেক পরেই ফিরে এলো সে। সামান্য একটু ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিলে—ভিতরে ঢুকতে পারো, ডাক পড়েছে তোমার।

ভিতরে অপেক্ষা করছিলেন—মিস্টার নয়—মিসেস্।—

ঘরে ঢুকতেই মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময়, দু'জনে দেখে নিলেন দু'জনকে।

কারণ বলা শক্ত, প্রসন্নতা ফুটে উঠলো না কারুরই মুখে।

—আমি এই য়্যাড্‌ভার্টিসমেণ্টটা দেখে এসেছিলাম—

কর্মপ্রার্থিনী নিজের চেয়ারটায় জড়োসড়ো হয়ে বসে কুণ্ঠিতভাবে বলে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি—হাতের লেশ-বোনা স্থগিত রেখে

নীরসস্বরে উত্তর করেন গৃহকর্ত্রী—আপনি পারবেন বলে মনে করেন ?

—এর আর পারাপারি কি ?···অল্প একটু হাসি দেখা দেয় মেয়েটির মুখে—ছোট্ট একটি বাচ্চাকে পড়ানো কি এমন শক্ত ?

—শুধু তো পড়ানো নয়—গৃহকর্ত্রী পদমর্যাদা অনুযায়ী ভারীক্কে চালে বলেন—শুধু পড়িয়ে কর্তব্য শেষ করলে চলবে কেন ? সারাক্ষণের জন্যে দেখাশুনা তদারকি সবই করতে হবে।

—সে তো নিশ্চয়ই—মেয়েটি সহজভাবে সায় দেয়—এতোটা খরচ করছেন যখন—সে দিকটা দেখাও আমার কর্তব্য থাকবে বৈ কি। তার জন্যে ভাববেন না, ঠিক হয়ে যাবে।

—আপনি থাকেন কোথায় ?

—শ্যামবাজারের ওদিকে।

গৃহিনীর অপ্রসন্ন মুখে একটু আলোক-রেখা দেখা দেয়।

—বলেন কি ? অতদূর ? এখানে এত দূরে—আসা কি স্থবিধে হবে আপনার ?

বেশ বোঝা গেল এই অল্পবয়সী এবং প্রায়-রূপসী-মেয়েটির আসার অস্থবিধেটাই বাঞ্ছনীয় তাঁর পক্ষে।

—অস্থবিধে আর কি ? সর্বদা থাকতে হবে এখানে—এইটাই তো মেন্ কন্‌ডিশান রয়েছে আপনাদের ?

—তা' আছে বটে !—গৃহকর্ত্রী আগের মতোই নীরসস্বরে বলেন —তবে আমাদের আইডিয়া হচ্ছে একটু 'এল্‌ডারলি'—মানে—দুরন্ত বাচ্চাকে 'ট্যাক্‌ল্' করতে হলে—বয়েসটা কিছু ভারী হওয়া দরকার।

—আপনার এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। ছোট্ট বাচ্চার ওপর

একটা ভারী বয়েসের ভার চাপিয়ে দেওয়াই কি ভালো? বরং যাতে সহজভাবে মিশতে পারে—

—আপনি আমার বেবিকে জানেন না—'বেবির' মা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাঁড়ির খবর প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না—বেজায় দুরন্ত আর সাংঘাতিক বেয়াড়া!

ভয় খাইয়ে দেবার জন্যে এটা একটা কূটনৈতিক চাল হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু কর্মপ্রার্থিনী নাছোড়বান্দা!

এতো বড়ো সাংঘাতিক কথা শুনেও ভয় খায় না। দিব্য হাস্যবদনে বলে—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবো, তার জন্যে আটকাবে না।

—আপনি তো বলছেন—'আটকাবে না', কিন্তু আমার নিজের দিক থেকেও তো বিবেচনা করবার কিছু থাকতে পারে!—স্পষ্টাস্পষ্টই মনের গলদ প্রকাশ করে ফেলেন ভদ্রমহিলা—আপনার মতো এতো কমবয়সী লোককে ঠিক উপযুক্ত মনে করতে পারছি না আমি।

কর্মপ্রার্থিনীর টান্ করে বাঁধা চুলের নীচে তক্তকে মাজা কপালে ঘাম ফুটে ওঠে শিশিরকণার মতো। সেও এবার কণ্ঠে আমদানী করে শুষ্ক কাঠিন্যের সুর।

—মনে না করাটা আপনার ইচ্ছাধীন। তবে বিবেচনাটা আগে করে নিয়ে—অন্য সব 'টার্মসে'র মধ্যে ওটাও উল্লেখ করা উচিত ছিল না কি?

বটে!

প্রথম দর্শনে একটু মিনমিনে ভালোমানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

ভেতরে জাত কেউটে! এঁকে পুষতে হবে বাড়িতে! আর কিছু নয়!

গৃহকর্ত্রী রুষ্টস্বরে বলেন—আপনার কাছে উচিত অনুচিত শিক্ষা করবার অবসর আমার নেই। মোটকথা আপনাকে দিয়ে চলবে না আমার।

চাকরির আশা বড়ো সর্বনেশে জিনিস।

কেউটে ফণা গুটিয়ে নিতে দেরী করে না।

এবার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর—দেখুন, আমার বড়ো বেশী দরকার—

—আপনার চাইতে অনেক বেশী দরকার অসংখ্য লোকের রয়েছে। দরকারটা একটা কোয়ালিফিকেশন্ নয়!

মুখের মতো কথা শুনিয়ে দিতে পেরে ভারী একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন মিসেস মজুমদার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন একটা অফিসের বড়োসড়ো অফিসার। চুণোপুটি উমেদারের সঙ্গে আর বেশী কি ভদ্রতা করবেন?

মেয়েটাকে কিন্তু বড্ডো বেহায়া বলতে হয়—এর পরেও বলে কি না—তাও আবার মুচকি হেসে···তা ছাড়াও—কিছু কোয়ালিফিকেশন তো রয়েছে ধরুন—এম, তে ফার্স্ট ক্লাশ, বি, এ, তে ইকনমিক্সে অনার্স ছিল, এদিকে—মিউজিকেও যথেষ্ট ঝোঁক আছে। স্পোর্টে, সুইমিঙে—

—থাক্। বোঝা যাচ্ছে আপনি একেবারে 'অলরাউণ্ড্' কিন্তু অতটুকু মেয়ের জন্যে এত'র প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না আমি! আপনি বরং চেষ্টা করলে এর চাইতে অনেক ভালো 'জব্' পাবেন।

—কোথায় ?—মেয়েটির কণ্ঠে যেন হতাশার সুর ফুটে ওঠে—চাকরির বাজার বড়ো খারাপ!···বলছিলাম—মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধে হয় না একবার ?

—অর্থাৎ তাঁর কাছে এছাড়া নূতন কিছু শোনবার আশা করেন নাকি ? করলে সেটা ভুল হবে।

প্রত্যেক শব্দটির কোণে কোণে ঝিলিক মারে একখানি ধারালো ছুরির ডগা।

আস্পর্ধা কম নয়!

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়! মনে করেছে ছলাকলা অনুরোধ উপরোধের কায়দায় কাজটা বাগিয়ে নেবে! বলাও যায় না, যে মানুষ—এই বেলা আপদ বিদায় করা দরকার। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে মিস্টারের।

নিরুত্তর মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে!

তার মানে সাহেবের আসার অপেক্ষা করছে।

আর নয়।

'বেবিজননী' এবার গাম্ভীর্যের চরম পর্দা থেকে বাণী প্রচার করেন—

—আমার কাছ থেকেই শেষ কথা পাচ্ছেন—আর কিছু আশা করে মিথ্যে কষ্ট পাবার প্রয়োজন দেখছি না। এতো বেশী করে যে বোঝাতে হচ্ছে আপনাকে, এজন্য দুঃখিত। আচ্ছা—আমার এ সময় অবসর কম—

অর্থাৎ সভ্যভাষায় 'দূর হও'।

কিন্তু কর্মপ্রার্থিনীর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে ঈশ্বর জানেন, এমন একটা সন্ধিক্ষণে, পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার মজুমদার!

এবং হঠাৎ একজন অপরিচিতা মহিলাকে দেখেই বোধ হয় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন।

—তুমি! হেঁটে এলে নাকি?—মিসেসের কণ্ঠস্বরে যেন আর্তনাদের আভাস—গাড়ির কি হলো?

—গাড়ি? গাড়িটা? ওঃ, গাড়িটা প্রায় দরজায় এসে খারাপ হয়ে গেলো!

উত্তরে গৃহিণী কি বলতেন কে জানে—নাছোড়বান্দা মেয়েটা ইত্যবসরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে নমস্কারের ছুতোয়। শুধু দাঁড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি—এগিয়েছেও খানিকটা।

উঃ কী বাচাল মেয়ে!

স্বচ্ছন্দে বলছে—আমাকে একটু অনুগ্রহ না করলে তো চলে না! মানে—ইয়ে—আজকের কাগজে একটা য়্যাড্‌ভার্টিস্‌মেন্ট দিয়েছিলেন না?······সেইটার জন্যেই এসেছিলাম। পেলে ভা-রী সুবিধে হতো আমার।

মিস্টার কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

কথার জের টেনে চলে মেয়েটা—ইনি তো আমাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনি কি বলেন?

—আমি—আমি—

এতেও যদি—কেউ 'তেলেবেগুনে' জ্বলে না ওঠেন, তা'হলে তিনি গৃহকর্ত্রী নামের অযোগ্য!

অতএব জ্বলেই ওঠেন ভদ্রমহিলা। জ্বলে উঠে বলে ওঠেন—দেখুন, এতোক্ষণ ভাবছিলাম—ভদ্রভাবেই বিদায় দেওয়া যাবে আপনাকে, দেখছি তা নয়।···যান, যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছেন আমার, আর নয়।

—কিন্তু চাকরি একটা যে বিশেষ দরকার আমার, মিস্টার মজুমদার!

মেয়েটির কণ্ঠে যেন অনুনয় ঝরে পড়ে।

অবশ্য এ সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবারই চেষ্টা তার!

আমি! আমি কি করবো? আমার দ্বারা কিছু—

কিছুতেই আর সহজ হতে পারেন না ভদ্রলোক।

আপনার দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব নয় বলছেন? তাহলে—আর কি করা যাবে? আমার দুর্ভাগ্য! অনেক আশা করে এসেছিলাম। তা দেখছি—আপনি নেহাৎই নিরুপায়। আচ্ছা নমস্কার! · হ্যাঁ···আপনাকেও!···এবারে—দেখুন চেষ্টা করে—মনের মতো একটি বুড়ি-টুড়ি জোটাতে পারেন কিনা। তবু কিছুটা নির্ভয়ে থাকতে পারেন

চাকরির আশায় হতাশ হলেও—কৌতুকছটায় মুখটা আলোকিত হয়ে ওঠে মেয়েটির।

বোঝা গেল—এতোক্ষণ অবোধের ভান করলেও—মিসেস মজুমদারের প্রবল আপত্তির মূল কারণ বুঝতে দেরী লাগেনি তার।

—অসহ্য!···বংশীলাল!···রামরতন!

মিসেস মজুমদারকে ব্যঙ্গ করতেই এসেছে তবে মেয়েটা? এত দুঃসাহস! কিন্তু তাই করে পার পেয়ে যাবে? তাঁরই বাড়িতে বসে! আর জড়ভরতের মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন মজুমদার সাহেব?

রাগে সর্বশরীর কাঁপতে থাকে তাঁর। চাকরদের ডেকে একেবারে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত কিনা ঠিক সাব্যস্ত করতে

না পেরে, নিজেই তিনি বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে ভিতর দিকের দরজা দিয়ে, হাতের লেস ক্রুসকাঠিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা সোফার ওপর।

ততক্ষণে অপরাধিনীর পালকের মতো হালকা পাতলা ঝরঝরে দেহটা যেন হাওয়ায় উড়ে গিয়ে দরজার বাইরে পড়েছে।

গেটের বাইরে পা দিতেই যেন পিছন থেকে আঁচলটা আটকে গেল!

না 'সহকার শাখা'য় নয়, পেরেকের খোঁচাতেও নয়, সুধু একটি সম্বোধনে!....'বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা' একটি পরিচিত ডাক!

—পারমিতা!

আটকে যাওয়া আঁচল ছাড়িয়ে নেওয়ার ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ায় —ধরে নেওয়া হোক—যার নাম 'পারমিতা'।...মুচকি হেসে বলে —আপনি আমার নাম জানেন নাকি? আশ্চর্য তো?

—পরিহাস থাক্ পারমিতা, বলো আমি কি তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারি না?

—কই আর পারলে?—বিদ্যুৎ খেলে ওঠে পারমিতার চশমায় ঢাকা ঈষৎ সোনালি দুটি চোখে...আশা করে এসেছিলাম—পুরনো বন্ধু—হয়তো চাকরীটা না দিয়ে পারবে না—

—আমি যে কতো নিরুপায় পারমিতা, তা যদি--

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, আহা! দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে।

—কাজটা যদি দিতে পারতাম তা'হলে—তা'হলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সুখী মনে করতাম পারমিতা!

—সত্যি ?···হাসির ঝিলিক ঠিকরে পড়ে ওর কথায়—সত্যি—কতো সহজে সুখী হতে পার তুমি ! বিধাতার আশীর্বাদ !

—কথা চাপা দিতে পাবে না পারমিতা, কিছু প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে দাও—এই নাও আমার চেক বই, যা খুশি ফিগার বসিয়ে নাও—

—আঃ দীপক ! বোকার মতো অতো ভোঁতা কথাগুলো বোলো না আর, দোহাই তোমার !···আচ্ছা···যাও পালাও, আর বেশী দুঃসাহস কোরো না। ওপরওলার ভয় নেই ?

পাখীর মতো যেন উড়ে চলে যায় পারমিতা।

খানিকটা তফাতে অপেক্ষা করছিল একখানা প্রকাণ্ড গাড়ি, দরজা খোলা ! ড্রাইভার নেই ! চালকের আসনে অর্ধশায়িত ভঙ্গীতে পড়ে পড়ে সিগারেট ধ্বংস করছিলেন—মালিক স্বয়ং।

দ্রুত লঘুপায়ে এসে গাড়িতে উঠে পাশে বসে পড়লো পারমিতা ! এখন আর কৌতুকের আভাস দেখা যাচ্ছে না মুখে, বরং বলা যায়—মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র—এমন একটা ব্যাঙ্ক ফেলের খবর শুনে এসেছে—যে ব্যাঙ্কে ওর মোটা টাকা জমা ছিল।

হাতের সিগারেটটা ফেলে সোজা উঠে ভদ্রলোক দরাজ গলায় বলে ওঠেন—হ'লো তোমার ?

—হ'লো।

—উঃ, এদিকে মশাতে প্রায় শেষ করে এনেছিল আমাকে। মনে হচ্ছিল যে কতো যুগযুগান্তর গেছো তুমি। এই সাউথ আফ্রিকার জঙ্গলে যে তোমার কোনো বন্ধু আছে, জানতাম না তো কখনো !

—আমার কতোটুকুই বা তুমি জানো ?

—তা বটে ! যাক্, দেখে বন্ধু খুব খুশি হলো তো ?

—দেখা হয়নি ।

—দেখা হয়নি ! বলো কি ? এতোক্ষণ তবে করছিলে কি ?

—খুঁজছিলাম । যদি দেখা পাই ।

—ছি ছি ! শুধু শুধু এতোটা সময় নষ্ট ? গরীব বন্ধুর বাড়ি আসছো বলে—এতো ঘটা করে গরীবটরীব সেজে এলে—সব বাজে হলো ? কি খবর ? বাড়ি ছেড়ে উঠে গেছেন বুঝি ?

—না । মরে গেছে ।

—মরে গেছে !

নিজের বাচালতার লজ্জায় মুহূর্তে মূক হয়ে যান ভদ্রলোক ।

কিন্তু কথা বলার একি শ্রীহীন ভঙ্গী পারমিতার !

আকস্মিক আঘাতে ? সত্যি ! বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে —মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া !

স্ত্রীর বাচনভঙ্গীর রূঢ়তা ঢাকতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোক নিজের কোমলতা দিয়ে—ইস্—মারা গেছেন ! কী ভয়ানক ? অদ্ভুত !

—কেন অদ্ভুত কেন ? মরাই তো মানুষের পেশা—স্বামীর আর একটু কাছে সরে আসে পারমিতা—আমিও একদিন মরে যাবো হয়তো !

ভালমানুষ ভদ্রলোক শোকে সান্ত্বনা দেবার উপযুক্ত কথা খুঁজে না পেয়ে, গাড়ির গতিটাই বাড়িয়ে চলেন ক্রমশঃ; আর—পারমিতা বোধকরি বন্ধুর মৃত্যু-শোকেই দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে সুরু করে এতোক্ষণ পরে ।

সকালবেলা—কাগজের এই বিজ্ঞাপনটাতে দৈবাৎ চোখ পড়ে যাওয়া পর্যন্ত—যে কৌতুক-অভিনয়ের কল্পনায় খুশিতে উপচে পড়ছিল সে সারাদিন ধ'রে, তার লেশ-মাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না আর!

কিন্তু কেন? আর কি, এছাড়া আর কি আশা করেছিল পারমিতা? কি হলে খুশী হতো?

অভাব

দিনের বেলায় অত কথা ভাববার সময় কোথায় ?

আঠারো ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যায় কে জানে। ভাবনা চিন্তা যা কিছু তোলা থাকে রাত্রির নিশ্চিন্ত অবসরের জন্য। অগাধ অবসর নয়—মাত্র ঘণ্টা ছয়েকের ব্যাপার, তবু কম নয়।

আঠারো ঘণ্টা ভূতের মতো খেটে বাকি ছ'ঘণ্টা ভূতের মতোই ঘুমানো উচিত হয়তো, কিন্তু জোর ক'রে সেই সর্বনাশা ঘুমকে তাড়ায় অমিতা। না তাড়ালে বাঁচবে কি ক'রে ?

রাত্রিটাও যদি দিনের মতোই অজ্ঞাতসারে কেটে যায়—কাজের চাপে না হোক—নিশ্ছিদ্র ঘুমের চাপে, নিজেকেই যে অমিতা বেমালুম ভুলে যাবে তা'হলে।···ভুলে যাবে—ওরও একদিন ষোল-বছর বয়স ছিল।····ছিল গানের নেশা····কবিতা লেখার চর্চা করতো মাঝে মাঝে।····ভুলে যাবে—ওর সেই ষোল বছরে শীতের শেষে হঠাৎ বসন্তের হাওয়া বইত যেদিন, অকারণ খুশিতে ছলছলিয়ে উঠতো মন, বর্ষার শেষে শরতের প্রথম সোনালি রোদ দেখলে ইচ্ছে করতো প্রেমে পড়তে।

রাত্রির অন্ধকারে সেই সোনালি দিনের কথা, ভেবে-ভেবে মনে রাখতে চেষ্টা করে অমিতা। বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে নিজেকে।

কিন্তু দিনের বেলায় অমিতাকে দেখলে কে বিশ্বাস করবে সে-কথা ?

শানানো ক্ষুরের মতো শানানো জিভ নিয়ে সংসার সুদ্ধ সকলকে যেন টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবিশ্যি অনিলের বৌও কম মেয়ে নয়। অমিতার চেয়ে বছর দু'একের ছোট হলেও কথায় কোনোদিন হার মানে না সে। জিভের চাইতে বুদ্ধির ধার তার বেশী, মা-মরা বুড়ি আইবুড়ো ননদের চাইতে সংসারে যে তার দাম আর দাবী দুটোই অনেক জোরালো একথা তা'র অজানা নেই, তাই সকাল বেলা ঘুম ভাঙা থেকে শুরু ক'রে দুপুর রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত ননদ-ভাজে যে আলাপ চলে সেটা আর যাই হোক রসালাপ নয়।

সাংসারিক অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে হলেও কলহের প্রধান কেন্দ্র অনিলের ছোট ভাই সুনীলকে নিয়ে। 'বুড়ো হাতি মিনসে' হয়েও আজ পর্যন্ত যে একটা পয়সা ঘরে আনতে পারে না সুনীল, এটা রেণুকার অসহ্য। অথচ বিদ্যের জাহাজ নাকি ছেলে!

—অমন বিদ্যের কপালে আগুন—মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রেণুকা বলে ওঠে—তুমি আর তোমার ছোড়দার বিদ্যের ব্যাখ্যানা কোরো না ঠাকুরঝি, গা জ্বালা করে শুনলে।

অমিতাও মুখঝামটা দিতে ছাড়ে না—গা তো জ্বলবেই, নিজের ভাইদের মতন না হ'লেই গা জ্বালা করে। ভাইদের তো 'ক অক্ষর গোমাংস!'

—তবু তো তারা আপনারা হাত-পা-মাথা খাটিয়ে 'করে' খাচ্ছে গো, কেউ কারুর ভাতে থাকে না। তোমার বিদ্যের জাহাজ ভাইয়ের মতন হাত-পা-গুটিয়ে বসে থেকে দু'বেলা ভাতের থালাটির গোড়ায় এসে বসে না। রক্ষে করো বাবা, মুখ্যুই ভালো।

—বলি বৌদি, চব্বিশ ঘণ্টা ছোড়দাকে ভাতের খোঁটা দিতে লজ্জা করে না তোমার, বাবা এখনো বেঁচে—

—গোড়া পেড়ে ঝগড়া করতে এসো না ঠাকুরঝি, এককথা

বললেই দশকথা শুনতে হবে। বাবা বেঁচে আছেন বলেই কিছু আর মোট মোট টাকা আসছে না ঘরে—যে, আদুরে খোকাটি বসে খেলে লোকের গায়ে লাগবে না। এই গুষ্ঠিবর্গ তো সব সেই একটা মানুষের ঘাড়ে, সেইটুকু বুঝে চললেই আর বেশী কথা শুনতে হয় না।

—মরে যাই! 'সেই একটা মানুষের' দরদে মরছেন একেবারে। দাদা তো আর কারুর আপনার লোক নয়, ওরই একলার!

—আপনার লোকের মতন ব্যাভার দেখলে আর দরদ করবার দরকার হ'ত না; দেখি না বলেই মরা—ব'লে কথায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে নিজের কাজে চলে যায় রেণুকা।

হাতের বঁটিটা নিজের মাথায় বসিয়ে মরতে ইচ্ছে করে অমিতার, কিন্তু অতোদূর আর হয়ে ওঠে না, শুধু হাতের কাছের আনাজপাতিগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুচি কুচি করতে থাকে। আর মিনিট পাঁচেক পরেই ঘুরে এসে রেণুকা বাঁকাচোখে তাকিয়ে বলে—সাধে কি আর দজ্জাল হয়েছি, অনেক দুঃখেই হ'তে হয়। এই যে দু'দিনের তরকারি এক দিনে কুটে শেষ করলে ঠাকুরঝি, কাল সকালে আবার রাবণের গুষ্ঠির পেট ভরবে কিসে? যাকে রোজকার করতে হয় না সে আর বুঝবে কি করে—কতো ধানে কতো চাল!

—রোজগারটা বুঝি আজকাল তুমিই করছো বৌদি? তা' এক রকম মন্দ নয়—তীক্ষ্ণ একটা বিষমাখানো হাসি দিয়ে কথাটা শেষ করে অমিতা।

হাসিটা অবশ্য কুমারী মেয়ের উপযুক্ত নয়, কিন্তু চব্বিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ের কাছ থেকে কৌমার্যের কমনয়ীতাটুকুই কি আশা করা চলে?....যে-মেয়ে—ষোল থেকে চব্বিশে এসে পৌছলো—যুদ্ধ

আর মহামারী, মন্বন্তর আর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র আগুনের উপর দিয়ে,....যে-মেয়ে অভাব আর অবহেলার বেড়া-আগুনে অহরহ খাক্ হচ্ছে।

আটবছর না আশীবছর? পৃথিবীর ইতিহাসে বিগত আটটি বছরের কি হিসাব লেখা হবে?

বুড়ো অবনীমোহনও কিন্তু ছেলের বৌয়ের দলে।

সুনীলের এই 'বসে খাওয়া' তারও দু'চক্ষের বিষ। জোয়ান ছেলে নীরবে এতো বাক্যবাণ হজম করে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকে, এটা চোখ চেয়ে দেখে সহ্য করা সহজও নয়। বৌ আর মেয়ের ঝগড়ার মাঝখানে এসে পড়লেই তাই মেয়েকে থামিয়ে দেন অবনীমোহন,—তুই থাম দিকি অমি, বুড়ো ঢেঁকির হয়ে ওকালতি করতে আসিস্‌নি। বাবু লাটসাহেব হরদম বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কাব্যি চিন্তা করছেন! ছ্যা ছ্যা!

রেণুকা শ্বশুরের কান বাঁচিয়ে টেনে টেনে বলে—কি জানি বাবা, শুনতে দু'জনেই এক মায়ের পেটের, ব্যাভার দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমার তো মনে হয় একজন সতাতো ভাই। ওমা, সেই মানুষটা উদয়াস্ত খেটে খুন হয়ে বাড়ি এসে বসে আছে—খেলো কি না খেলো দৃকপাত নেই,—'ছোড়দার চা হল কি না'—'ছোড়দা খাবার খেয়েছে কি না'—তারই খোঁজ! অবাক কাণ্ড বাবা!

—'সে মানুষটা'কে তো দেখবার লোকের অভাব দেখি না বৌদি, ছোড়দাকে আমি না দেখলে খেতে পাবে ও?

—ওঃ, তাই বুঝি ছোড়দার তদারকি করতে এ বাড়িতে পারমানেণ্ট পোস্ট নিয়েছো ঠাকুরঝি?

রেণুকাও হাসির সঙ্গে যে বিষটুকু ছড়ায় সেটা বাইশ বছরের

উপযুক্ত নয়, কিন্তু দোষ দেওয়াই বা চলে কি করে? অভাব আর অনটনের তীক্ষ্ণ কামড় তাকেও কি সহ্য করতে হচ্ছে না অবিরত?

পৃথিবী যেখানে দিনের পর দিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে—আসছে বন্ধ্যা হয়ে, মানুষ কোথায় পাবে উদারতা? পাবে দাক্ষিণ্য?

অমিতা সুনীলের ঘরে এসে ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই কটু-কণ্ঠে বলে ওঠে—দেখো ছোড়দা, এই অপমানের ভাত ফের যদি খাও তুমি, ভালো হবে না বলছি। গলায় দিতে দড়ি জোটে না তোমার? ছি ছি।

সুনীল উঠে বসে হাসতে থাকে, বলে—দড়ি জুটছে না কি করি, দে চা-টাই আপাততঃ দে—যেটা জুটছে—

—আমি হ'লে নর্দমায় ফেলে দিতাম এই চা।

ঠক্ করে পেয়ালাটা বসিয়ে রাখে অমিতা।

—পাগল হয়েছিস্! একপেয়ালা চায়ের আজকাল দাম কতো জানিস?

—জানবো না আবার! একজন চব্বিশঘণ্টা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে সে হিসেব বুঝিয়ে ছাড়ছেন। তোমার আমার খাওয়া বাজে খরচ বৈ'ত' নয়।

—নয়ই তো!—বলে পেয়ালাটা তুলে নেয় সুনীল।

অমিতা মিনিটখানেক চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তীক্ষ্ণ-স্বরে বললে—ছোড়দা?

—কি রে?

—আবার তোমার জ্বর হয়েছে?

—জ্বর? ওতো হয়েই আছে।

—তবু তুমি কাউকে বলবে না?

—পাগল হয়েছিস? বলে কি হবে?

—চিকিৎসা-পত্তর কিছু হবে না তাহলে?

—ক্ষেপেছিস! ভাত হয় না, চিকিৎসা!—শখ দেখো মেয়ের।

—এমনি করে পড়ে পড়ে মরতে চাও?

—'চাই' সেকথা তোকে কে বলছে রে বাপু? উপায় কি?

অমিতা একটা ভাঙা টুলে বসে পড়ে বলে—আমি কিন্তু আজ সবাইকে বলে দেবো!

—লাভের মধ্যে হবে—এই বিছানাটাও জুটবে না, সোজা ফুটপাথ দেখিয়ে দেবে সবাই।

—ছোড়দা!

তীক্ষ্ণ একটা জন্তুর মতো আওয়াজ বেরোয় অমিতার কণ্ঠ থেকে।

—ছোড়দা, তুমি তা'হলে হাসপাতালেই যাও না, তবু তো চিকিৎসা হবে।

—তুই এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ আছিস অমি, হাসপাতালই ক ফুটপাথে পড়ে আছে? কতো কাঠখড় পোড়াতে হয় ওর জন্যে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্বভাবছাড়া মিনতির সুরে বলে অমিতা—চুপি চুপি দাদাকে বলে দেখি না ছোড়দা.?

—দাদাকে? সুনীল হেসে ওঠে—বলেছিলাম একদিন।

—বলেছিলে? কী বললেন দাদা?

বললেন—ও কিছু না, স্নায়বিক দৌর্বল্য। অলসতার ফল।

—তা' বলবেন বৈ কি! কেমন গুরুর শিক্ষা পাচ্ছেন দিনরাত। উঃ, ইচ্ছে করে এ সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাই একদিন।

—আগুন? সে আর তুই নতুন ক'রে কি ধরাবি রে পাগলা মেয়ে। যা পালা এঘর থেকে।

—কেন, তোমার অসুখের ছোঁয়াচকে ভয় করব নাকি আমি?

—না রে, একজনের আসবার কথা আছে।

—কে সে?

—একজন বন্ধু—ডাক্তার।······যেন অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দেয় সুনীল।

—আমি থাকবো।

—তুই আবার কি করবি? না না, যা।

—যাবো না—খুশি আমার।

বলতে বলতেই বন্ধু ডাক্তারটি এসে হাজির হ'ল।

—ওর কি হয়েছে?

গম্ভীর আর নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করে অমিতা।

—ওর?

ডাক্তার-বন্ধু ঢোক গিলে বলেন—এই একটু উইক্ হয়ে পড়ছে, এই আর কি!

—জ্বর হয় কেন?

—ওটাও উইক্‌নেসের জন্যে।·······ওর জন্যে কিছু না। এই টনিকটা আনিয়ে দেবেন, আর ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন একটু, এই আর কি। ঠিক হয়ে যাবে দু'চার সপ্তাহে। ভাববেন না কিছু,·····ডিমটিম ফলটল দুধ-মাখন খাওয়াবেন কিছুদিন····আচ্ছা সুনীল চলি।···

অমিতার উপস্থিতির ভয়েই বোধ করি তাড়াতাড়ি চলে যান ভদ্রলোক।

—অমি, শুনলি তো? ডিমটিম, ফলটল্, দুধছানা, মাখন-মিশ্রি হো হো ক'রে হেসে ওঠে সুনীল।

রান্নাঘরে আসতেই রেণুকা যেন মুখিয়ে ওঠে—থাক্ থাক্ ঠাকুর-ঝি, কাজে আর হাত দিতে হবে না, তোমার পেয়ারের ছোড়দার সঙ্গে গল্প করোগে যাও, একলাই পারবো আমি। আশীষদা' কতকাল পরে এসেছে, দুটো খেয়ে যেতে বলেছি। একলা বসে আছে বেচারা—ধড়ফড় ক'রে মরছি, আর উনি সেই যে চা দিতে গিয়েছেন —সে আজও গেছেন কালও গেছেন। এতো যে কিসের গল্প তা'ও জানি না। আমরা তো বাবা বরের সঙ্গে পাঁচমিনিট বই দশমিনিট কথা কইতে পারিনে। ঘুম পায়, হাই ওঠে। ভাইটিও যেমন কুনোবেরাল—

অন্যদিন হলে হয়তো অমিতা একটা কটু উত্তর দিয়ে বসতো, কিন্তু আশীষের নাম শুনে থতমত খেয়ে যায়। আশীষ?...কোন্ আশীষ? ক'টা আবার আশীষদা আছে রেণুকার!

আশীষ এসেছে আর অমিতা টের পায়নি? আশ্চর্য!

কতক্ষণ এসেছে সে! অমিতার খোঁজ করেনি!

অনেক প্রশ্ন তোলা পাড়া করলেও একটা প্রশ্নই করে অমিতা —আশীষদা এসেছেন? জানি না তো, কতক্ষণ এসেছেন?

অমিতার নম্রতায় রেণুকাও কিছুটা নরম হয়—এইতো খানিক আগে। খেয়ে যেতে বললাম। আজ ছ'সাত বছর পরে দেখা, শুধু-মুখে যেতে বলি কি ক'রে?....কী ভয়ানক সব যুদ্ধের গল্প, শুনলে হাতে পায়ে খিল ধ'রে যায় বাবা!...দেখো যদি এই কপির তরকারিটুকু ক'রে লুচি দু'খানা ভেজে নিয়ে যেতে পারো। আলু-বেগুন ভেজেছি আমি, মিষ্টি আনতে গেছেন তোমার দাদা।

দারিদ্র্যের জীর্ণতা ঢাকা দিতে একটু ভালো মত আয়োজন না ক'রে উপায় থাকে না। আগের দিনের সেই নেহাৎ কলেজে-পড়া আড্ডাবাজ আশীষ তো নয়—জীবনে অনেক উন্নতি ক'রে ফিরেছে আশীষ—অনেক টাকার মালিক হয়ে।

রেণুকা চ'লে গেল 'ভয়ানক সব যুদ্ধের গল্প' শুনতে, পরিপাটি ক'রে রান্না ক'রে তুললো অমিতা।···আশ্চর্য! তরকারিতে নুন দিতে ভুলে গেল না, পানে চুন বেশী দিয়ে ফেললে না। দিব্যি নিখুঁত ভাবেই সব তৈরী হয়ে গেল।···আড়াল থেকে দেখলে খাওয়া-দাওয়া।

দেখা হ'ল—খাবার পরে চলে যাবার সময়।

ছেলে কাঁদছে বলে রেণুকা ঘরে চলে গেছে—আর অনিল বেরোল টিউশনিটা ঠেকাতে।····আশীষ মৃদু হেসে পানটা হাত থেকে নিয়ে বললে—ফুরসুৎ হ'ল ?

—হ'ল।

সুধু এইটুকু বলতে পারলে মুখরা অমিতা।

—তুমি এতো রোগা হয়ে গেছো কেন? বিশ্রী হয়ে গেছো একেবারে!

নেহাৎ অনায়াসে মন্তব্য প্রকাশ করতে পারলে আশীষ অমিতার সম্বন্ধে। অমিতা পারছে না কেন? কই বলতে পারছে না কেন—তুমিই বা এতো মোটা হয়ে উঠেছো কেন? বিশ্রী হয়ে গেছো একেবারে!

বলতে না পারুক, বুঝতে ভুল হয় না অমিতার—সত্যিই বিশ্রী হয়ে গেছে আশীষ। সুধু বাইরেটা নয়, ভিতরটাও বিশ্রী রকমের

স্থূল হয়ে গিয়েছে তার। চোখের তারায় পড়েছে সেই স্থূলতার ছায়া।

কলেজে-পড়া খদ্দর-পরা চোখের তারায় আলো-জ্বলা সেই ছেলেটিকে আবিষ্কার করা শক্ত এই উগ্র সাহেবটির মধ্যে।

কিন্তু কেনই বা করা যাবে?

পৃথিবীর এই প্রলয়ের দিনগুলো কি ওর ওপর দিয়েও ব'য়ে যায়নি?

জীবনে উন্নতি করেছে বলে বয়েস বাড়বে না? দারিদ্র্যে বয়স বাড়ে—প্রাচুর্যেও বাড়ে বৈ কি!

ওর উগ্র বিদেশী পোষাকটার সঙ্গে মানানসই উগ্র চুরুটের গন্ধটা বারেবারে সেই কথাই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেক দিন আগের এমনি একটা সন্ধ্যা কল্পনা করতে চেষ্টা করে অমিতা....'স্থান আর পাত্র' আছে অভিন্ন, সুধু কালটা বদলেছে।... ঠিক এইখানটায় দাঁড়িয়েই সেদিন কুণ্ঠিত গলায় বলেছিল আশীষ—কতো কি দিতে ইচ্ছে করে তোমায়, কিন্তু কি-ই বা আছে আমার?

বুজে-আসা গলায় অমিতা উত্তর দিয়েছিল,....নিজের কাছে যা আছে তাই না হয় দাও না?

ভীরু দুর্বল ছেলে,—পারেনি—হেসে পালিয়ে গিয়েছিল। যে-বয়সে হাতে হাতটুকু ঠেকালেই মনে হয় মস্ত একটা অপরাধ, এ সেই বয়সের কথা।

আজকের আশীষ আর একজন।....এর সঙ্গে হয়তো বা প্রেম করা যায়—প্রেমে পড়া যায় না। ওর আলো-নিভে-যাওয়া চোখের তারায় লেখা রয়েছে সেই নগ্ন পরিচয়।

আজকে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু দিতে পারে আশীষ—অমিতা যদি চাইতে পারে।...চাইলেই দিতে পারে—সুনীলের চিকিৎসার

খরচ, পথ্যের দাম—সব কিছু। গায়েও লাগবে না নিশ্চয়। দশ বিশ হাজার টাকা নাকি পকেটে পকেটেই ঘোরে ওর।

চলে যাবার সময় তবে ওর হাত চেপে ধরবে না কেন অমিতা?

—তোমার তো আজকাল অনেক টাকা, দাও না কিছু?

—টাকা?

আশীষ যেন আছাড় খায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা!....ওছাড়া আজ আর কি দেবার আছে তোমার? দাও না কিছু?

—কতো চাই?···অন্ধকারে প্রেতের মতো শোনায় আশীষের গলা।

—যা পারো—ছুশো-চারশো-হাজার—

অনুচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে আশীষ—অতো নেই কাছে—এই নাও।

অন্ধকার হলেও বুঝতে দেরী হয় না—একটুকরো কাগজ হলেও একশো টাকা আছে ওতে।

একশো। তাই বা কি কম।

তবু তো কিছুদিন ভালো-ভালো খাওয়াতে পারবে সুনীলকে। টনিক কিনবে ছু'বোতল।···বৌদির মুখ-নাড়াটা কিছু কমবে।

ছু'যুগ পার হয়ে এসেও তবু অমিতা কোনোখানে একটু কাঁচা আছে বৈ কি! এ হিসেব নেই অমিতার—টাকা খরচ করলেই হয় না, আয়ের পথটারও হিসেব দিতে হয় সংসারের লোককে।

রেণুকা বলে—কি জানি বাবা, এতো নবাবি কোথা থেকে হচ্ছে! 'ছোড়দা' 'ছোড়দা'—সোনাদানা খাওয়ানো হচ্ছে ছোড়দাকে। কী রাজ্যপদ পেলো ছোড়দা তাও জানি না।....শুনিয়ে শুনিয়ে আরো অনেক কিছু বলে—সাতজন্মে তো সংসারে একটি আধলা দেবার

নাম নেই, দু'টাকা যদি রোজগার হয়েই থাকে, সেকি সবটাই নিজের পেটে পুরতে হয় !

সুনীল উপার্জন করলো—একথাও যেমন অসম্ভব, ছাদ ফুঁড়ে টাকা পড়াটাও তো তেমনি অসম্ভব ? তাই নানাদিক থেকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মূল অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করে রেণুকা !···

বেশী দিন নয়, দিন কয়েক পরেই হদিস মিললো। বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আশীষের সঙ্গে দেখা হয়েছে রেণুকার।

এরপর—বাড়ি এসে সে যদি অমিতাকে মারতে বাকি রাখে সেটা আর অন্যায় কি হয় ?

বাকী যে রেখেছে সেই যথেষ্ট। মারাইতো উচিত ছিল।

সমস্ত দিনে জিভের আর বিরাম হয় না রেণুকার।

—গলায় দড়ি। গলায় দড়ি। ছি ছি ছি। শুনে মনে হ'ল, পৃথিবী দু'ভাগ হও। লজ্জায় মরে গেলাম একেবারে। এই নিয়ে কম টী-টী পড়ে গেছে ওখানে ?···আশীষদা যখন হেসে হেসে বললে—'তোর ননদের স্বভাব-চরিত্র ভালো আছে তো রেণু' ? তখন যেন বিষ খেতে ইচ্ছে হ'ল আমার।···হাত ধ'রে যদি টাকা চাইতেই পেরেছ ঠাকুরঝি, তবে আর—

বাকীটুকু আর বলে না রেণুকা, বোধকরি ঘৃণার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পায় না বলেই কিংবা বাইশ বছর বয়সের ধ্বংসাবশেষ ওর বক্তব্যের দরজা আটকে ধরে।

বাকিটুকু অমিতাই ভাবে।···ভাবতে থাকে দিন আর রাত্রি। স্বভাব ! কিসে নষ্ট হয় ওটা ! তেমন নষ্ট হয়ে যাবার মতো অভাব কি এখনো আসেনি ? তাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে আশীষ। ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হ'তে অনুরোধ করেছে রেণুকা !

অবিনশ্বর

পথ আর পথ।

সভ্যতার শতবাহু প্রসারিত হচ্ছে দিকে দিগন্তরে। পথ তৈরী হচ্ছে পাহাড়ের বুক চিরে। অরণ্যের বুক চিরে, সমাজ আর শৃঙ্খলার বুক চিরে। পথই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এখানে তৈরি হচ্ছে মালবাহী লরীর পথ। বন-সম্পদকে নিঃশেষ ক'রে নিয়ে যেতে পারবার তোড়জোড়। অমিতচারী যুগ, জননী বসুন্ধরার সমস্ত সঞ্চয় দু'হাতে উড়িয়ে দিয়ে যাবে, ভবিষ্যত বংশধরের জন্য কিছু রেখে যাবে না। মাটির উপরে নয়, মাটির গহ্বরে নয়, কোথাও কিছু রাখবে না....কে জানে কি করবে সেই হতভাগা আগামীকাল, এই ফাঁপা সভ্যতা আর ফোঁপ্‌রা পৃথিবীকে নিয়ে ?

বিদ্যুৎযন্ত্র বসিয়ে কাটা হচ্ছে জঙ্গল! মানুষের হাতের লোহার টুকরোগুলো এখন যেন ছেলেমানুষের খেলনা হয়ে গেছে। ওরা এখন শুধু জঞ্জাল সরায়। কুড়ুল কোদাল করাত! একদা ওরা জীবন্ত ছিলো, অসাধ্য সাধন করতে পারতো। কোটি বছরের পৃথিবীর গায়ে ওরাও ঢের পথ বানিয়েছে। কিন্তু এখন ওরা হাস্যকর। কালো পাথরের পুতুলের মতো যে মানুষগুলো কোদাল হাতে এগিয়ে আসছে, ওরা শুধু জঞ্জাল সরাবে। ওর চাইতে বেশী ভূমিকা আর ওদের নেই।

ভারতবর্ষে আর ভারতবর্ষের বাইরে ; ভূগোলকের এ-পিঠে আর ও-পিঠে ; কোথাও কোনোখানে আর ওদের জন্য কোনো মহান্ ভূমিকা রচিত হবে না। ওদেরই পূর্বপুরুষের হাতের যে বিশাল বিশাল কীর্তির নমুনা হাজার হাজার বছরের রোদ-জলকে অবহেলা ক'রে আজও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ইরাণে আর চীনে, মিশরে আর রোমে, এখানে আর সেখানে, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও আর সময় নেই এদের। এরা শুধু প্রপিতামহের সেই যন্ত্র হাতে নিয়ে প্রাণপণে জঞ্জাল সরাচ্ছে।

জঙ্গলের মাঝে মাঝে তাঁবু পড়েছে গোটাকতক,—ছোট, বড়ো সস্তা, দামী ! ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে অধস্তনের। …তাঁবুর সামনে খুঁটি পুঁতে পুঁতে বসানো হয়েছে আলো। পাঞ্চ-লাইটের তীব্র শিখা রাতের নিঃসীম পটে যেন বাঘের চোখের মতো জ্বলে।…রাতে বোঝা যায় না—এই অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ালে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, আর সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত মস্তিষ্কের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।—হ্যাঁ, রাতে ওকথা বিশ্বাস করা শক্ত। রাতে ওই প্রখর আলোগুলোকে অরণ্যচারী হিংস্র জন্তুর চোখ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

ওই আলোর পিছনে পিছনে যে জমাট অন্ধকার, সে যেন ঘন শ্যাওলা রঙের তাঁবুগুলো নয়, জমাট হয়ে রয়েছে আদিম পৃথিবীর নির্লজ্জ বর্বরতা।

সাব্‌ওভারসীয়ার হরিপদ দাস জরীপবাবু মুকুন্দ বিশ্বাসের গ্রামের লোক। তাই সন্ধ্যাটা দু'জনে এক তাঁবুতেই কাটান।…

এঁর ঘরে উনি, অথবা ওঁর ঘরে ইনি। বোতলের ঠুনঠান ওঠে; হাসির হর্‌রা ওঠে। কাছে পিঠে রান্নাঘর থেকে উত্থিত সদ্য নিহত কোনো পশু অথবা পাখীর মাংস সিদ্ধ হওয়ার গন্ধ অরণ্যকে সচেতন ক'রে দেয় মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে।

আজ কিন্তু শব্দ গন্ধ দুটোই অনুপস্থিত! আজ ওদের মনে সুখ নেই।

—সাহেব এসে গেলো তাহ'লে? বললো মুকুন্দ বিশ্বাস।

হরিপদ দাস নিঃশ্বাস ফেলে বলে—হ্যাঁ!

মুকুন্দ ছিল্লো নিজের তাঁবুতে, দূর থেকে ছুটে আসা মোটরখানার হেড্ লাইট্‌টাই শুধু দেখেছে। হরিপদদাসকে যেতে হয়েছিলো অভ্যর্থনা করতে। এইমাত্র ফিরেছে সে 'সাহেব'কে তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখে এসে!

মুকুন্দ নড়েচড়ে বলে—কি বললো-টললো?

—বলবে আবার কি?

—মানে আর কি, ভাবভঙ্গী কিরকম বুঝলে? সুবিধে হবে?

—খোদা জানে!

হরিপদর উত্তরগুলো অনিচ্ছুক, কিন্তু মুকুন্দর কৌতূহল প্রবল। হরিপদর মনমরা ভাবের কারণ একটা কিছু আন্দাজ ক'রে বলে—খুব দুঁদে বলে মনে হলো না কি?

—দুঁদে? ফোঃ!....এ প্রশ্নে হরিপদ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠে। বলে—দুঁদে লোক হরিপদ দাস ঢের দেখেছে মুকুন্দ, হরিপদ তার জন্যে ভয় খায় না। দুঁদে লোককে ক্ষুদে ক'রে ফেলবার মন্তর হরিপদর জানা আছে। ব্যাপারটা তো তা' নয়। কথা হচ্ছে একেবারে ছোকরা!....এদের কাছে কাজ করতে যেন প্রেস্টিজে বাধে।

কাজেরও কিছু জানে না তা'হলে ?

তা' বললে কি হবে,...হরিপদ মুখটা বিকৃত ক'রে বলে—ডাঁট্ তো ঠিক থাকবে ? জানি তো ? দুটো ধমক-চমক গালমন্দ বুঝি বাবা, ওই যে 'আপনি'র মধ্যে দিয়ে মিছরির ছুরি মারে, ওই অসহ্য। ছোকরা অফিসারগুলো বড়ো নাক উঁচু হয় !

—নাক উঁচু !...মুকুন্দ বিশ্বাস অনেক অভিজ্ঞতার মুচকি হাসি হাসে—সংসার সমাজের বাইরে এই জঙ্গলে এসে অনেক উঁচু নাকই খ্যাঁদা হ'তে দেখলাম দাদা !...কলকাঠি তো আমাদেরই হাতে !

এবার একটা রহস্যময় হাসি হাসে মুকুন্দ বিশ্বাস।

এ রহস্য হরিপদ দাসের অজ্ঞাত নয়।....কিন্তু আজ হরিপদ দাসের মনে সুখ নেই। তাই বলে,—ঠিক বুঝতে পারলাম না লোকটাকে।

একঘণ্টাতেই কি আর বোঝা যায় হরিপদদা ? প্রথম প্রথম এমন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলে।...যতই হোক, চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস তো আছে ? সে-বার পার্বতীপুরের ওদিকে যখন কাজ হচ্ছিলো মনে নেই ? ও, তুমি তো তখন ছুটিতে ছিলে ! ছিলাম আমি আর অভিলাষ ভট্‌চায্ !...সেও এলো এক ছোকরা সাহেব; মিত্তির না কি যেন। প্রথমে এমন ভাব দেখালো, বুঝলে হরিপদ্‌দা, যেন ভীষ্মদেবের পুষ্যিপুত্তর।...তারপর—হুঁ !.... দাবার চাল চালতে হয় দাদা, দাবার চাল। জায়গা বুঝে বোড়েটি টিপে দিতে হয়।

এবার যেন হরিপদকে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত দেখায়। বলে—ভেঁজে রেখেছিস নাকি কিছু ?

—না রেখে আর মুকুন্দ বিশ্বেস নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে ?

…ওদিকে 'ঘাল' ক'রে ফেলতে পারলেই, দেখবে আপনি নাক থেব্ড়ে যাবে।…আর যাই হোক—দুর্বলতার সাক্ষীর ওপর চোখ রাঙাতে থতমত খাবেই! এই স্বভাব মানুষের!

নরচরিত্রে অভিজ্ঞ মুকুন্দ বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসে।

পর্ণকুটিরও নয়, কাপড়ের টুকরোর ছাউনী মাত্র। ইচ্ছে হলেই চোখের নিমিষে এখান থেকে ওখানে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। তবু—তার ভিতরেই আরাম আয়েসের উপকরণের অভাব নেই।… পদমর্যাদা এমন জিনিস, ঘন অরণ্যের অন্তরালে, সভ্যজগতের অনেক, অনেক যোজন দূরেও রাত পোহাতেই সোনালী পেয়ালায় চা জোটে।

তাঁবুর বাইরে টেবিল বার করিয়ে নিয়ে চা খাচ্ছিলেন সাহেব; মুকুন্দ তাক্ বুঝে এসে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো।…ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন সাহেব, অবশ্য স্রেফ্ ভদ্রতার খাতিরেই।

—ওরে এই, একটা চেয়ার বার ক'রে দে!

মুকুন্দ হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে—চেয়ার থাক স্যার, চেয়ার থাক। আপনার সামনে চেয়ারে বসবো কি?

সাহেবের মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন নাকি? বসুন। আপনাদের আশ্রয়ে এলাম, কাজটাজ বুঝিয়ে দেবেন তো!

বেয়ারা একটা বেতের চেয়ার এনে বসিয়ে দেয়।

মুকুন্দ যেন অগত্যাই বসে। আড়চোখে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।…রং ফর্সা নয়, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য আছে, একেই বোধহয় 'উজ্জ্বলশ্যাম' বলে। সকালের আলো প'ড়ে আরো একটু

জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। পাতলা নাক, চশমাঢাকা চোখ, চিবুকে আর চোয়ালে কেমন একটু নমনীয়তা। যা বয়েস, তার চাইতেও যেন কম দেখায়!

মুকুন্দ মনে মনে হাসে···গলা টিপলে দুধ বেরোয় এখনো! পেড়ে ফেলতে আর কতক্ষণ?···যে লাভের ব্যবসা চলছে তাদের, যে চোরা পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে হাজার হাজার টাকার হিসেব, সে আর এ খোকাবাবুর ধরবার সাধ্য নেই।····তবে চালাক আছে, বলছে কিনা 'আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়লাম'!····

সিকি মিনিটে এসব ভেবে নিয়ে কথা সুরু করে—আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো স্যার?

সাহেব মৃদু হেসে বলেন—কষ্ট কিসের?

—এই জঙ্গুলে রাস্তা!···ইয়ে—একি আর আপনাদের যুগ্যি স্যার!

—আমাদের যুগ্যি নয়?····সাহেব গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন—বাবার পয়সা খরচ ক'রে এতোদিন তবে শিখলাম কি মিস্টার—

—বিশ্বাস।

—মিস্টার বিশ্বাস? জঙ্গলেই তো কাজ আমাদের।

অতঃপর কাজ সংক্রান্ত খানিকটা কথাবার্তা হয়।···এবং বোধ করি মুকুন্দর অতিবিনয় আর হাত কচলানির জ্বালায় অস্থির হয়েই উঠে পড়েন সাহেব। বলেন—উঠি, একটু বেড়িয়ে নিই আপনাদের দেশটা।

—বিলক্ষণ! বিলক্ষণ!···বিনয়ে নুয়ে পড়ে মুকুন্দ—কিন্তু সাবধানে চলাফেরা করবেন স্যার, বুনো জন্তুর উৎপাত চারিদিকে!

—সে উৎপাত দিনের বেলাতেও আছে না কি?

কৌতূহলী প্রশ্ন করেন সাহেব।....ভয়ের চিহ্ন দেখা যায় না মুখে।

একটু আশ্চর্য হয় বিশ্বাস।....এই ভয় দেখালে তো সাহেবরা প্রথমেই ঘাবড়ান! এবং সেই ঘাবড়ানির সুযোগেই মুকুন্দ দেহ-রক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে সঙ্গ নেয়। যতো বাজে কথা বোঝানোর সময় তো তখনি। কিন্তু সে সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। তবু চোখ গোল গোল ক'রে বলে—জন্তু-জানোয়ারকে বিশ্বাস কি স্যার? বিশেষ ক'রে বুনোজন্তু! সঙ্গে যাই বরং।

মৃদু হেসে প্রত্যাখ্যান করেন সাহেব—নাঃ! লাগবে না! সকালবেলা!

মুকুন্দ আর একবার মনে মনে হাসে।....তা সত্যি! সকালবেলা ভয় নেই। ভয়ঙ্কর হচ্ছে রেতের জানোয়ার। মুখে বলে—বলছিলাম কি স্যার, কাজের লোক-টোক কি রকম লাগবে?

—লোক? কুলির কথা বলছেন?....সাহেব একটু অবাক হ'ল।

—না, না, কুলির কথা বলছি না, মানে আপনার বাড়ির জন্যে।

—বাড়ি?...ও হো হো! ভারি সুন্দর হাসিটা।—বাড়ি তো এই কাপড়ের ছাউনী।

—আজ্ঞে যতোই হোক—রান্না-টান্না ঘরগেরস্থী কাজের জন্যে? কুলিদের মেয়েগুলো—

—না না! সে সব কিছু লাগবে না। সাহেব আত্মস্থভাবে বলেন—আমার চাপরাশীই আমার পক্ষে এনাফ্!

—তাহলেও স্যার, আপনাদের ঘরে দু' পাঁচটা লোক না খাটলে মানাবে কেন? অবিশ্যি এখেনে সকলেই আপনার চাকর, তবু—

—না না। মেলা লোক নিয়ে আমার কি হবে?

—লোকগুলো আশা ক'রে থাকে স্যার! যখনি যে সাহেব আসেন ওরা কাজ পায় কি না? বখশিষ-টখশিষ মেলে। ওই আশায় হাঁ ক'রে—

এবার সাহেবের মুখে একটু চিন্তার ভাব দেখা দেয়।...কি মুস্কিল...কাজই যে নেই।....তার চাইতে আপনি এক কাজ করবেন মিস্টার বিশ্বাস, যারা প্রত্যাশা ক'রে থাকে, এমন লোকদের পাঠিয়ে দেবেন, এমনই কিছু বখশিষ দিয়ে দেবো!

হাতে চাঁদ পায় মুকুন্দ বিশ্বাস। নিজের কথার ফাঁদেই নিজে পড়ে গেছে সাহেব।

—তাই করবো স্যার, আজ্ঞে তাই করবো! বড়ো গরীব এরা স্যার। পয়সার জন্যে এরা গুলি খেয়ে মরতে পারে।

তুলনা শুনে সাহেব আর একবার হেসে ওঠেন।

তাঁবুর সামনে পাঞ্চলাইটের তীব্র আলো, পিছনে নিঃসীম অন্ধকার। সেখানে আলোর প্রবেশ নেই!

সাব্ওভারসীয়ার আর জরীপবাবু, কেরানী আর চাপরাশী, যে যার আপন তাঁবুতে নিয়েছে আশ্রয়। কে জানে তার মধ্যে কে বেছে নিয়েছে নিশ্চিন্ত নিদ্রার শান্তি, আর কে আপনাকে ঘিরে পাপের বৃত্ত রচনা ক'রে চলেছে।

হাতকাটা গেঞ্জি, পাতলা পায়জামা, আর কোথাও নেই কোনো বাহুল্য। টেবিল ল্যাম্পটার সামনে মাথা নীচু ক'রে বই পড়ছেন সেন সাহেব। সকালের রোদের মতো, ল্যাম্পের আলোটাও যেন উজ্জ্বলশ্যামকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

হঠাৎ বইয়ের উপর একটা ছায়া পড়লো। চমকে তাকালেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—কে ?

ছায়া কথা বললো না, শুধু টেবিলটা চেপে ধ'রে দাঁড়ালো।

মাজা-ঘষা স্বাস্থ্যসম্পন্ন গঠন, গ্রাম্য চেহারার উপর বিকৃত আধুনিক সজ্জার পালিশ লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা। মুখে চোখে একটা দুঃসাহসের ছাপ।

—কে তুমি ?

—কেউ না! বলে মেয়েটা মুখ নীচু ক'রে ফিক্ ক'রে একটু হাসলো।

সেন সাহেব চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন।...কোথাও নেই জনমানবের সাড়া। বুকের ভিতরটা কি হিম হয়ে গেল তাঁর? বোঝা গেলো না। স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠেই বললেন—তাঁবুর দরজা তো বন্ধ ছিলো, ঢুকলে কি করে ?

—পেছনে আর একটা দরজা আছে, বাইরে থেকে খোলা যায়।

বলে মেয়েটা এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, বোধহয় বসবার জায়গার আশায়। সে ইসারায় দৃষ্টিপাত করলেন না সেন সাহেব, শুধু চিবুক আর চোয়ালের নমনীয় গড়নটা বদলে গেলো।

—তোমাকে পাঠিয়েছে কে ?

মেয়েটার মুখের চটুলভাবটা একটু কুঁকড়ে গেলো, টেবিলের উপর নখের দাগ কাটতে কাটতে বললো—কেউ না!....আমি নিজেই এসেছি।

—ওঃ। কিন্তু কেন ?

—কেন ? ...হঠাৎ আবার ফিক্ ক'রে একটু হাসলো মেয়েটা সরাসরি মুখের দিকে তাকিয়ে।....ঠোঁটের কোণে হাসির জেরটা

রেখেই বললো—শুনলাম আপনি গরীবদের ডেকেছেন বখশিষ দেবেন ব'লে।....তাই!

এটা নিশ্চিত, অনধিকার প্রবেশকারী মেয়ে না হয়ে যদি পুরুষ হ'ত, তাহলে একটি কথা বলারও সুযোগ পেতো না, বিনাবাক্যব্যয়েই বিতাড়িত হতো! বক্তব্য তার যাই থাক। কিন্তু একটা তরুণী মেয়েকে বিনা-বাক্যব্যয়ে দূর করা শক্ত।...বিশেষত মেয়েটাকে ঠিক কুলি মজুরদের বলেও মনে হচ্ছে না।

সেন সাহেব গম্ভীর গলায় বলেন—এইটা কি বখশিষ নেবার সময়?

যে সপ্রতিভকে 'বাচাল' বলে, মেয়েটা বোধ হয় সেই পর্যায়ের, তাই চটপট জবাব দেয়—সাহেবরা ত তাই দেন!

—ও!

সেন সাহেব তাঁবুর ও-দেয়ালের দিকে চলে যান, আঙটায় ঝোলানো কি একটা নিয়ে আসেন। মেয়েটার সামনে তুলে বলেন—এটা কি জিনিস চেনো?

মেয়েটার মুখে এবার ভয়ের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জঙ্গলের বাসিন্দারা এ জিনিসকে চেনে। পথে বেরোনোর সময় প্রায়শঃই সাহেব-সুবোর হাতে থাকে। কাঁটা লাগানো চাবুক!...বুনো কুকুর আর কুলি সায়েস্তা করবার অস্ত্র।

—চেনো এটা?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা হঠাৎ কেঁদে ফেলে—মারবেন না বাবু, ...আমাকে পাঠিয়েছে, আমি ইচ্ছে ক'রে আসিনি। দোহাই বাবু মারবেন না!

চাবুকটা নামিয়ে সেন সাহেব, ভ্রুকুটির সঙ্গে একটু হাসি মিশিয়ে বলেন,—নাঃ, তোমাকে মারবো না! মারবো তাদের যারা তোমাকে পাঠিয়েছে! চলো আমার সঙ্গে। দেখি কে—

মেয়েটা চোখ মুছে বলে—ওদের দোষ নেই বাবু!

—ওদেরও দোষ নেই? দোষটা তাহলে কার?

স্পষ্ট আর উচিত উত্তর একটা বোধহয় মুখের আগায় এসেছিলো, সামলে নিয়ে মেয়েটা মাথা নিচু ক'রে বলে—অন্য অন্য সাহেবরা যখন আসেন—তাঁরা—

—আচ্ছা থাক, বুঝেছি। আলনায় ঝোলানো সার্টের পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট নিয়ে মেয়েটার সামনে ফেলে দিয়ে সেন সাহেব বলেন—এই নাও। যাও।

মেয়েটা নেয়ও না, নড়েও না।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলে যাও।...ধমকের মতো শুনতে লাগে কথাটা!

—এক্ষুনি চলে গেলে ওরা বকবে!

—ওঃ! চলো আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।—পৌঁছে দেবো। কোথায় বাড়ি তোমার?

মেয়েটা যে কি বলে, বোঝা যায় না।

সেন সাহেব গেঞ্জির উপর একটা ঢিলে গাউন চাপিয়ে চাবুকটা হাতে নিয়ে তাঁবুর দরজা খুলতে থাকেন।

—আমি একলাই যাচ্ছি—মেয়েটার কণ্ঠে অস্বস্তি।

—না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো। টাকাটা তুলে নাও।...

আদেশের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয় কথাটা!

—না! মেয়েটা জিদের সুরে আপত্তি করলো!

—না কেন? তোমরা তো গরীব, টাকার দরকার নেই?

—ভিক্ষে নেবো কেন?

—ওঃ! তা' ভালো! বেশ থাক।

খোলা মাঠে নেমে পড়েন সেন সাহেব। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোটা যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

পাশাপাশি চলতে থাকে তুজনে।

—এভাবে খাটতে তোমার লজ্জা করে না?

মেয়েটা রুদ্ধকণ্ঠে বলে—ও কথা আমাকে কেউ কোনদিন শেখায় নি বাবু! জরীপবাবু আমাদের দেশের লোক। সে-বারে বন্যের সময় মা বাপ সব গেলো, মুকুন্দদা নিয়ে এলো, বললো—চাকরি ক'রে দেবে। তখন তো বুঝিনি, তখন বয়েস কম—

চুপ ক'রে যায় মেয়েটা।

অনেক জেরা আর অনেক আক্ষেপোক্তির পর মুকুন্দ আবার একবার প্রশ্ন করে—তাঁবুর দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলো? এ্যাঁ!····ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে যে হরিপদ্দা!

পদ্মা মুকুন্দ আর হরিপদর রাতের আহার এখানেই সারা হয়েছে, একপাশে তিনখানা এনামেলের সান্‌কিতে তিনজনের ভুক্তাবশিষ্ট প'ড়ে···এ-ধারে তুই বন্ধু বোতল নিয়ে বসে।

পদ্মা দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নদূতের ভূমিকা নিয়ে।

হরিপদ তুই হাত উল্টে বলে—তাজ্জব বটে!

মুকুন্দ প্রায় মেয়েমানুষের মত কাঁদো কাঁদো গলায় বলে—তুমি তো 'তাজ্জব' বলে গা হাল্‌কা ক'রে ফেলছো হরিপদ্দা, এখন

আমার কিঁ হবে বলো?....চাকরিটাই খসবে, না পাঁচজনের সামনে চাবুক খাবো?

হরিপদ বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলে—সে সব কিছু হবে না হে মুকুন্দ, সে তুমি 'সিওর' থাকো। দিনের আলোয় ওই ছেঁড়া কথা নিয়ে নাড়া চাড়া করবে না সাহেব।...কিন্তু তুই কি বলে ফেল্ মেরে চলে এলি বল্ তো পদ্মা? তোর ওপর আমরা এতো ভরসা রাখি, আর ওই এক ফোঁট্টা ছোঁড়াকে—

হঠাৎ যেন দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে পদ্মা। আর সেই জ্বলন্ত চোখ তুলে বলে—মানুষ তো কখনো দেখোনি হরিপদদা, দেখেছো খালি জানোয়ার!

ওব্ বাবা—! ও মুকুন্দ, এ বিদ্যেবতী বলে কি! জগাই মাধাইয়ের মতন হঠাৎ উদ্ধার হয়ে গেল নাকি? টাকাটা সুদ্ধু ফেলে রেখে এলো! পাঁচ পাঁচটা টাকা!....নাঃ পদ্মা, তুইও বাবা তাজ্জব বানালি।

—আমি যাচ্ছি।

নিজের আস্তানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় পদ্মা!

—আহা-হা এখ্খুনি যাবি কেন? এই তো সবে এগারোটা, —মুকুন্দ খপ্ ক'রে ওর একটা হাত চেপে ধ'রে বলে—মেজাজটা বিগড়ে দিলি, বোস না দুটো গল্পগাছা করি।

আঃ ছাড়ো—!

হাতের উপর একটা কেঁচো কেন্নো উঠলে যেভাবে হাত আছড়ায় লোকে, সেইভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পদ্মা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—ছুঁয়ো না বলছি মুকুন্দদা, ভালো হবে না।

—ভালো হবে না! একেবারে 'ভাল্লো' হবে না! ওরে ব্যস! আমাদের পদ্মরাণী যে—

—খবরদার মুকুন্দদা, ছোটলোকমি কোরো না।···তোমাদের আমি ঘেন্না করি বুঝলে? কুকুর শেয়ালের মতো ঘেন্না করি!

মুকুন্দর রোষদৃষ্টিতে পড়লে যে ভবিষ্যতে কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা না ভেবেই গটগটিয়ে বেরিয়ে যায় মেয়েটা। আর পথে পড়েই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।···রাতচরা পাখী, বুনোজন্তুকেও ভয় নেই ওর।

নিজের বুদ্ধিতে আস্থাওয়ালা ধড়িবাজ দুটো লোক হাঁ ক'রে খানিক তাকিয়ে থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলে—হঠাৎ ব্যাপারটা কি হ'লো বলো তো?

—খোদা জানে।

মুকুন্দর আশ্রিত, মুকুন্দর হাতের পুতুল, আর মুকুন্দর ভয়ে তটস্থ পদ্মা, হঠাৎ এত সাহস পেলো কোথা থেকে এই ভেবে অবাক হয়ে যায় ওরা। তা'ও যদি সাহেবের সুনজরে পড়তো, তো,—আস্পর্ধার একটা মানে পাওয়া যেতো। কিন্তু এটা কি ক'রে হলো? অন্নদাতার মুখের উপর স্পষ্ট বলে গেল, 'তোমাকে আমি ঘেন্না করি!'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগেও পদ্মা নিজেই কি জানতো, মুকুন্দ হরিপদদের এতো ঘৃণা করে সে? এই তো খানিক আগেই এক সঙ্গে বসে খেয়ে গেছে, হেসে হেসে আর রান্নার তারিফ ক'রে।

মুকুন্দ আর হরিপদ! কে জানে হয়তো বা এরাও কোনোদিন নিজেরাই নিজেদেরকে ঘৃণা করতে শিখবে!

তা'হলে কি পৃথিবীও কোনদিন একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে না? মানুষ লোভের হাত বাড়িয়ে যতোই নিঃশেষ ক'রে ফেলতে চাক তাকে, অবিনশ্বর থাকবে তার প্রাণের সঞ্চয়!

পত্রাবরণ

শনিবারটা উৎসবের দিন। এ দিনে বিকেলবেলাও রান্না ঘরের চালে ধোঁয়া দেখা যায়। গৌসাইদের পড়োবাড়ির বাগানে খেলতে খেলতে এই ধূমকুণ্ডলী চোখে পড়ায় চমকে উঠল পিতু।

আরে, আজ শনিবার ?

সকালে ঠাকুমা বলেছিল বটে! মনেই নেই। হাতের ধুলো ঝেড়ে পিতু বলে, 'আর খেলব না ভাই। বাড়ি যাই।'

সঙ্গিনী লাবণ্য মিনতি বচনে বলে ওঠে, 'এখ্খুনি যাস নে ভাই, নক্‌খিটি! আর এক দান খেলে যা।'

পিতু বান্ধবীর মিনতিতে ঈষৎ নরম হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। বিবেচনা করে অনুরোধ রাখা সম্ভব কিনা। নাঃ বেলা পড়ে এসেছে, কে জানে আকাশ কখন চারিদিকে সোনা ঢেলে দিয়েছে।

'না রে না, আর্জ বাবা আসবে। যাই ভাই।'

লাবি ঠোঁট উল্টে বলে, 'বাবা আসবে বলে অমন করিস কেন রে ? একলা তোরই বাবা আসবে নাকি ? আমারও তো আজ বাবা আসবে। আমি তোর মতন অমন ছুটছি ?' পিতু বোধ করি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিপন্নভাবে বলে, 'তোর বাবা যে বুড়ো।'

'এই অসভ্য মেয়ে!' লাবু চোখ পাকিয়ে বলে, 'আমার বাবাকে বুড়ো বললি ? এই বুদ্ধি হচ্ছে ? বাবা না তোর জেঠামশাই হয় ? রোস্, তোর মাকে বলে দিচ্ছি গিয়ে।'

যদিও লাবু এবং পিতু অভিন্নহৃদয়া, তবু কেউ কারো অপরাধ অগ্রাহ্য করতে রাজী নয়! অবশ্য জেঠামশাই-জাতীয় ব্যক্তিকে বুড়ো বলা অপরাধের মধ্যে গণ্য কিনা, এ নিয়ে তর্ক তোলে না পিতু, ম্লান মুখে বলে, 'বলে দিসনি ভাই, তোর দুটি পায়ে পড়ছি। দোষ হয় জানি না, পাকা চুল দেখি, তাই—বলে দিবি না তো?'

ক্ষমাময়ী লাবি আশ্বাসের সুরে বলে, 'আচ্ছা বেশ বলে দেব না। তার বদলে আর এক দান খেল্।'

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে রে। বাবা আসবার আগে মুখ হাত ধুয়ে ফরসা জামা পরে নিতে হবে তো?' লাবি হেসে উঠে বলে, 'বাবাঃ বাবাঃ! বাবা যেন আর কারুর থাকে না। একলা তোরই আছে। বাবা আসবে খেলব না, বাবা আসবে সাজবো, বাবা কি কুটুম?'

পিতু এবং লাবুর মধ্যে বয়সের তারতম্য না থাকলেও বলাই বাহুল্য বুদ্ধির তারতম্য আছে। পিতু বান্ধবীর উপহাসবাক্যে বিব্রত হয়ে গিয়ে ব'লে বসে, 'বাঃ, কুটুম হবে কেন? ছেঁড়া জামা প'রে থাকলে যে বাবা বুঝতে পারবে আমরা গরীব।'

এরপরও লাবুর হাস্যের ফোয়ারা নিষ্ক্রিয় থাকবে, এমন আশা করা চলে না। অদম্য হাসির ফোয়ারায় বান্ধবীকে প্রায় নাকানি চোবানি খাইয়ে লাবি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'উঃ বাবাঃ, কী নেকী রে তুই! তোরা গরীব আর তোর বাবা বুঝি খুব বড় লোক? তোর বাবা গরীব বলেই তো তোরাও গরীব।'

পিতু আরক্ত মুখে বলে, 'ইস্! কক্খনো বাবা গরীব নয়। দেখিস গিয়ে। কী ফরসা জামা! কত জিনিস আনে!' লাবি মুচকি হেসে সুরে সুর মিলিয়ে বলে, 'তোর মার গায়ে কত গয়না!'

লাবির বয়েস আট, তাতে কিছু এসে যায় না। কথা শিখে অবধি পাকা কথাই কইতে শিখেছে লাবি। মা পিসিমার অসতর্কতায় এমন অনেক মেয়েই শেখে।

গয়নার কথায় পিতুর পরাজয়। ও অভিমানভরে বলে, 'বেশ বেশ আমরা গরীব। হলো তো?'

'ও বাবা মেয়ের আবার রাগ হলো। আচ্ছা বাবা ঘাট মানছি! কাল খেলতে আসবি তো?'

'এলে যে মা বকে!'

রবিবারে পিতু মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ পিতুর মা পছন্দ করে না, সে-তথ্য লাবির জানা, তাই এই প্রশ্ন।

অবশ্য উত্তরটাও জানা ছিল লাবির, তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'ওই তো মুশকিলের গোড়া। রবিবার এলেই যেন হাড় জ্বলে যায় আমার।' পিতু বিস্ফারিত চক্ষে বলে, 'রবিবার এলে হাড় জ্বলে যায়?...বাবা এলে ভালো লাগে না তোর?'

'নাঃ! মোটেই না। এসে আমায় কী রাজা ক'রে দেয় শুনি? এসে তো খালি মা'র সঙ্গে গপ্‌পো করে, আর তাসের আড্ডায় ছোটে। আমার লাভের মধ্যে খালি বকুনি। দেখবে, কি বকবে! কলকাতায় থাকে তাই রক্ষে!'

'আমার বাবা বকে না।'

হৃতগৌরব ফিরে পায় পিতু!

লাবি বান্ধবীর পিতৃগর্বে আঘাত হানে না। গম্ভীরভাবে বলে, 'হ্যাঁ। পঙ্কজকাকা লোক ভালো। যা বাবা, তুই বাড়ি যা। শেষে আবার মা'র কাছে মুখ্‌নাড়া খাবি!'

আট বছরের লাবি বর্ষীয়সীর ভঙ্গিতে নিজের পথ দেখে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। 'বালিকা' বলে যাদের অগ্রাহ্য করা হয় অনেক সময় তাদের সম্মেলন-সভায় কান পাতলেই এ চৈতন্য সঞ্চার হয়, অগ্রাহ্যের যোগ্য তারা নয়।

পিতুর মতন মেয়েরাই বরং ব্যতিক্রম! চোরের মত বেড়ার দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখে পিতু। নাঃ, বাবার আবির্ভাবের ঘোষণা কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে না। অতএব নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়া যায়। অতঃপর দু'চার খাবলা জল হাতে মুখে রগড়ে জামাটা বদলে চুলে চিরুনির দুটো টানের ওয়াস্তা। আর পিতুকে পায় কে!

বালতি-ঘটির ব্যাপারটা যথাসাধ্য নিঃশব্দ রাখার চেষ্টা করেও কিন্তু ফল হয় না। জলে ঘটি ডোবানোর ছোট্ট শব্দটুকুও রান্নাঘরের অবস্থিত মানুষটির কান এড়ায় না।

'পিতু।'

ভর্ৎসনার সুর বাজে ঘর থেকে।

'খেলা ফুরোচ্ছিল না বুঝি? চট ক'রে মুখ ধুয়ে নাও। চৌকির ওপর জামা আছে!'—যাক্, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে! কৃতজ্ঞ পিতু এক মুহূর্তে করণীয় কর্তব্য সেরে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলে,—'আজ কী রাঁধবে গো ঠাকুমা?'

ঠাকুমা মুখ তুলে সহাস্যে উত্তর দেন, 'তুই-ই বল, তোরই তো ব্যাটা আসছে!'

'ধ্যাৎ!'

ঘরে ঢুকে উবু হয়ে বসে পিতু। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলে, 'কচুরি করছ মা?'—কচুরি করার কারণটা মধুর লজ্জার! মনোরমার মুখে একটু চাপা হাসি খেলে যায়। উত্তর ঠাকুমাই দেন, 'হ্যাঁ রে! তোর বাবা যে কচুরি খেতে বড্ড

ভালোবাসে। অবিশ্যি ওদের মেসে কতো খায়দায়, খাওয়ার অভাব কিছু নেই, তবু ঘরের জিনিস বলে কথা! রোজের রোজ একটু ক'রে তেল জমিয়ে—'

মনোরমা মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলে, 'থাক মা ওসব কথা। ছেলেমানুষ-বলেটলে ফেলবে।'

ঠাকুমা অপ্রতিভ অবস্থা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলেন,—'পিতু আমার তেমন মেয়ে নয়, খুব বুঝদার আছে। কি বলিস পিতু ?'

পিতু সলজ্জ হাসি হাসে।

মনোরমা বলে, 'ভাজা তো হচ্ছে, তোর ভাগের দু'খানা খেয়ে নে!'

রসনায় জল সঞ্চার হয়, তবু দুর্দমনীয় বাসনা দমন ক'রে পিতু তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'এখন খিদে পায়নি। বাবার সঙ্গে খাবো।'

'সঙ্গে তো খাবি, সামনে বসে হ্যাংলার মত হাত চাটবি তো ?' মনোরমা হাসে।

নাঃ, পিতুর সেই একদিনের অসতর্কতার কাহিনী কেউ আর ভুলে যেতে রাজী নয়।

পিতু আরক্ত মুখে বলে, 'ইস্! রোজ যেন তাই করি! সে তো শুধু একদিন।'

মনোরমা হাসির সঙ্গে বলে, 'আর আজ কি করবি ? বলবি, "কচুরি কি জিনিস ঠাকুমা ? ও কি রকম খেতে ঠাকুমা ?" তাই তো ?'

ঠাকুমা বিপন্ন নাতনীকে রক্ষা করেন। কৃত্রিম ভৎর্সনার সুরে বৌকে বলেন, 'তোমার খালি ওকে খ্যাপানোর তাল্! ও আমার তেমনি বোকা না কি ?—হুঁ! কী বলবি রে পিতু ?'

পিতু পৃষ্ঠবলের ভরসায় সোৎসাহে বলে, 'কী বলব? বলব কচুরি তো পেরায়ই খাই, ঠাকুমা নিত্যি করে। কচুরি খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি ধ'রে গেছে বাবা, তুমি ভালো ক'রে খাও!'

মনোরমা হেসে ফেলে বলে, 'অত কথা বলতে হবে না তোকে, রক্ষে কর। সামনে বসে হাত-পাত না চাটলেই হ'ল!'

পিতু লুব্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়, আজকের এই উৎসবের সুবর্ণ সুযোগে অপ্রত্যাশিত কোন ভোজ্য বস্তু চোখে পড়ে যায় কি না! এরকম পড়ে মাঝে মাঝে। যেমন সেদিন পড়ে গিয়েছিল। নারকোলের মালার মধ্যে এতটি নারকোল কোরা! পিতু চায়নি, শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'ওটা কী ঠাকুমা?' তাতেই ঠাকুমা এতটা তুলে নিয়ে পিতুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

নাঃ, নারকোল কোরা আজ নেই, একটা বাটিতে গোটা কতক ছোলাভিজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র, যা কাঁচা খাওয়া চলে।

'ছোলাভিজে কী হবে ঠাকুমা?'

মনোরমা তিরস্কারের সুরে বলে, 'কী আবার হবে, রান্না হবে। খিদে পেয়েছে, যা খাবার কথা, খা না বাপু।'

ঠাকুমা নাতনীকে বোঝেন।

তিনি তিরস্কার করেন বৌকে, 'খিদে পেয়েছে সে কথা তো ও তোমায় বলতে আসেনি বাছা! সব তাতে তাড়া দাও কেন? ছোলাভিজে দিয়ে লাউ রাঁধবো রে পিতু। লাবিদের গাছের লাউ আধখানা দিয়ে গেল লাবির পিসি। দিব্যি কচি, তোর বাবা রুটি দিয়ে লাউঘণ্ট ভালোবাসে। নে দুটো চিবো ততক্ষণ।'

ঠাকুমা দু'টি ছোলাভিজে তুলে নিয়ে নাতনীর দিকে এগিয়ে দেন।

কিন্তু পিতু সহজে হাত বাড়াবে না। ওর বুঝি মান নেই? আড়চোখে শুধু মা'র দিকে তাকায়।

'হয়েছে, আর লজ্জায় কাজ নেই' —মনোরমা হেসে ফেলে একটিপ নুন নিয়ে বলে, 'নে, নুন দিয়ে ভালোলাগবে।'

'রান্না ঘরে কেন? বাইরে গিয়ে বসগে না।'

এটা একটা সংকেত।

'বোসগে না' মানেই 'দেখগে না'। 'বাবা আসা' দেখাও যে মস্ত একটা আমোদ!

একবার ঠাকুমা ছিল না, গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল ত্রিবেণীতে, সে-বার পিতু আর মা দু'জনে দেখেছিল বেড়ার দরজার কাছে একঘণ্টা আগে থেকে দাঁড়িয়ে।

'বাবা! বাবা! বাবা! বাবা এসেছে, বাবা!'

রান্না ঘরের মধ্যে মনোরমার বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে। এগারো বারো বছর বিয়ে হয়ে গেছে, তবু ওঠে।

পঙ্কজ হাসতে হাসতে আর মেয়ের কথার নকল করতে করতে ঢোকে, 'বাবা! বাবা! বাবা!……দেখো বাবু ম্যাজিক দেখো, পিতু রাণীর বাবা দেখো।…চার চার পয়সা টিকিট বাবু, চার চার পয়সা টিকিট!' এই রকম স্ফূর্তিবাজ লোক পঙ্কজ। সব কথাতেই ওর হাঁসি।

এরপরও বাবার পিঠ ধরে ঝুলে পড়বে না, এত ধৈর্য পিতুর নেই।

'এই হ'ল আদিখ্যেতা শুরু।' মনোরমা বেরিয়ে এসে চাপা ধমক দেয়, 'মানুষটা তেতে পুড়ে এল, ওকে একটু স্থির হতে দে?'

পিতু কিন্তু আর এখন মাকে ভয় করে না।

করে না দু'কারণে। প্রথম তো বিরাট সহায়—বাবা কাছে। দ্বিতীয়ত মায়ের মুখে চোখে যে চাপা হাসির বিদ্যুৎ-ব্যঞ্জনা, সেটুকু পিতুর চোখ এড়ায়নি।

এ মাকে যেন ভয় না করলেও চলে।

মহামায়ার শুদ্ধাচার পাড়াবিখ্যাত। রেলের কাপড়চোপড়ে জলের পাত্র স্পর্শ করা চলে না। মনোরমা কুয়োর পাড়ে গিয়ে পঙ্কজকে হাত মুখ ধোবার জল ঢেলে দেয়।

পঙ্কজ মুচকে হেসে খাটো গলায় বলে, 'তৃষ্ণার জলকে আটকে রেখে পা ধোবার জল দিয়ে পুণ্য নেই।'

মনোরমা তেমনি ভঙ্গীতে বলে, 'হয়েছে খুব হয়েছে। এবার মেয়ে বড় হচ্ছে, কথাবার্তা সামলাতে শেখো।'

'মেয়ে ? —ঢের দেরী আছে বড় হ'তে।' বলে অদূরবর্তিনী কন্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায় পঙ্কজ।

'সেই তো আরো জ্বালা! এখ্‌খুনি হয়তো মাকে জিজ্ঞেস করতে ছুটবে, 'ঠাকুমা, তেষ্টার জল মানে কী ?'

হেসে ওঠে দু'জনেই।

মুখ ধুতে এত দেরি······পিতু ভাবে। মনোরমা বলে, 'আবার সেই রাশ ক'রে জিনিস এনেছো ? তোমার যেন বাজে খরচ করা এক বাতিক। এইটুকু তো সংসার, এত কে খায় বলো তো ? গেল বারের আনা পাঁপর তো সবই রয়েছে, আবার পাঁপর এনেছো !'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, 'তা তোমরা যদি না খাও, আর আনবো না !'

'এই দেখ মুশকিল! কত খাব! তরি-তরকারির জ্বালায় এটা ওটা খাবার জো আছে?'

'এত দিচ্ছে কে? আর কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত করোনি তো?'

হাসতে থাকে পঙ্কজ!

'এইবার তাই করবো ভাবছি। যা অসভ্য হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। ঘর করার অযোগ্য!'

মহামায়া হাঁক পাড়েন, 'অ পঙ্কজ, মুখ ধোওয়া হ'ল? কচুরি ক'খানা যে পান্তো হয়ে গেল! জলটল খেয়ে গপ্পো করিস না বাছা!'

'হ'ল তো?' বলে স্বামীর দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ হেনে দ্রুতপদে সরে গেল মনোরমা।

পঙ্কজ দাওয়ায় উঠে চা জলখাবার খেতে বসল।

খেতে দেওয়ার ভার মহামায়ার নিজের হাতে। বৌ দিলেও তাঁর তৃপ্তি হয় না! ওদের ধরন-ধারণ জানতে তো আর বাকি নেই মহামায়ার! হয়তো খাওয়ার সময়ই এমন হাসাহাসি জুড়ে দেবে যে, যে খাবে সে টের পাবে না কী খেলাম, যে দেবে সে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাবে 'কেমন খেলে'?

বহু যত্নে বহু চেষ্টায় 'প্রাণ কুটে' তৈরি জিনিসের এমন অপব্যয় সহ্য হয় না মহামায়ার। তিনি কাছে বসে খাওয়াবেন, কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করবেন, আর একটু নেবার জন্য সাধ্য সাধনা করবেন, তবে তো তৃপ্তি!

মাছটা মহামায়া ছোঁন না, রবিবার দিন মাছ আসে, মনোরমাই রাঁধে! মহামায়া দাঁড়িয়ে পরিবেশন করান। একদিন খলশে মাছের টক দিতে ভুলে গিয়েছিল মনোরমা, সেই অপরাধে তাকে

ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করেছিলেন মহামায়া। এমনিতে তিনি বৌয়ের প্রতি স্নেহশীলাই, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে নয়।

পঙ্কজ. জুত ক'রে বসে বলে, 'কচুরি আর আলু-মরিচ? দি গ্র্যাণ্ড! আজকের জলযোগটি যে রীতিমত রাজসই!'

মহামায়া বিগলিত স্নেহে বলেন, 'কচুরি তো নামেই! কপালগুণে আজকেই ঘিটা গেছে ফুরিয়ে, তেলেই ভাজলাম। বলি গরম গরম খাবে, মন্দ লাগবে না।'

'মন্দ?' পঙ্কজ এক কামড় খেয়ে চরম পরিতৃপ্তির স্বরে বলে, 'হুঁঃ! তেলে ভাজারই তো তার বেশী গো মা! এই তো আমাদের মেসে কড়া কড়া ঘি উড়িয়ে রাঁধছে, পারুক দিকিনি একদিন এমন একখানা দি গ্র্যাণ্ড কচুরি ভাজতে! সত্যি বলতে মা, ক'দিন থেকেই তেলে ভাজা ছোলার ডালের কচুরি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।'

মহামায়ার চোখের জল অসংবরণীয় হয়ে ওঠে। কষ্টে বলেন, 'ওরে, সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—মায়ের প্রাণ! কথায় আছে—"ছেলে হাঁকে এপারে, মা কাঁদে ওপারে।" নদীর ওপার থেকে মায়ের প্রাণ কাঁদে!'

অতঃপর কাঁসিতে অবস্থিত বাকি কচুরিগুলি ছেলের পাতে পড়তে বিলম্ব হয় না।

এবার পঙ্কজের রাগের পালা।

'ব্যস ব্যস! সবগুলো ঢেলে দিলে? নাঃ তোমাদের কাছে ভালো বলবার জো নেই! এই আট ন'খানা আমি এখন খাবো?'

'কেন খাবি না? রাতের রুটি কম করছি!'

'আর তোমরা খাবে না? দু'খানাও তো রাখতে হয়?'

'বৌমার ভাগ ঘরে. আছে, পিতুকে দিয়ে দিয়েছি, আবার কার জন্যে রাখবো ? আমি কি রাতে ডালের জিনিস খাই ?'

পঙ্কজ ক্ষুব্ধভাবে বলে, 'ছি ছি ! তা'হলে আজ করলে কেন ? কাল সকালে করলেই হ'ত।'

মহামায়া সস্নেহ হাস্যে বলেন, 'শোন কথা ! ভারি তো পদার্থ জিনিস, দু'খানা তেলেভাজা কচুরি ! তার আবার মা খেলো না, হ্যানো হ'ল না।—আমি কি খাচ্ছি না ? বৌমা আমার যখন-তখনই ত' খাবার করছে। এই আজই বলছিল, "মা, দশমীর দিন আপনাকে পেটভরে ডালপুরী খাওয়াবো।" খাবার করা বৌমার এক বাতিক।'

'হ্যাঁ ! তোমার বৌ নইলে আর এত গুণের কে হবে ! হ্যাঁরে পিতু, রোজ খাস কচুরি ডালপুরী ?'

'রোজ।'

পিতু যেন একটা মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে তাকায়। কোথায় সেই দুর্লভ বস্তু ?....দৈনন্দিন ভাত আর রুটিকে কেন্দ্র ক'রে যে দু-একটি বাহুল্য বস্তুর দর্শন মেলে, সে হচ্ছে কচুর শাক, ওলের ডাঁটা, অথবা পাড়ার লোকের প্রীতি উপহার লাউটা কুমড়োটা। বাবা আলু আনে, সে-আলুর প্রায় সব ক'টিইতো তোলা থাকে পরবর্তী শনি-রবিবারের জন্যে। তাতে অবশ্য পিতু দুঃখিত নয়। শনি-রবিবার উৎসবের দিন, পিতুও জানে।

কিন্তু এতকথা ভাবতে এক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। পিতু ঢোঁক গিলে বলে,....'রোজ নয়, পেরায় পেরায় খাই।'

অবোধ পিতু মিথ্যা ব'লবে না, এটা নিশ্চিত। পঙ্কজ পুলকিত বিস্ময়ে বলে, 'আশ্চর্য ! তোমরা এত কম খরচে কেমন চমৎকার ক'রে সংসার চালাও, আর আমাদের মেসে ! হুঁঃ !'

মহামায়া সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'তবে যে বলিস, তোদের খাওয়া দাওয়া খুব ভালো।'

'আহা, তেমনি পয়সাটাও তো ভাল গো, তোমাদের তিনজনের যা খরচ না হয়, আমার একার তাই খরচ।'

'ষাট্ ষাট্, তা হোক। পুরুষ বেটাছেলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়। তার একটু দরকার বৈকি!'

পিতু মহোৎসাহে বলে, 'এখানে যে সব জিনিস সস্তা বাবা। তোমাদের কলকেতার মত তো না! আমরা কত খাই! ঠাকুমা তো নিত্যি পায়েস রাঁধে, তোমার জন্য আমাব মন কেমন করে। কাল আবার রাঁধবে ঠাকুমা?'

মহামায়া ভাঁড়ারের চিনির কথা স্মরণ ক'রে ইতস্তত ক'রে বলেন, 'দেখি, গয়লা মুখপোড়া যদি ভালো দুধ দেয় তবেই। জল ঢালা দুধ হ'লে করছি না।'

পঙ্কজ গেলাসের জলটা সব শেষ ক'রে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে বলে, 'খুব জল ঢালে বুঝি?'

নিছক গোয়ালার নিন্দে করতে মহামায়ার বোধ করি বিবেকে একটু বাধে। কারণ গোয়ালাটা অবিবেকী নয়। তার কাছে নানা বর্ণের দুধ মেলে।

মহামায়া যদি টাকায় আড়াই সের দুধের খদ্দের হন, দুধের রং নীল না হয়ে উপায় কোথা?

ছেলের কথাকে তাই এড়িয়ে গিয়ে মহামায়া বলেন, 'বাড়তি নিতে চাইলেই ঢালবে। সব তো খদ্দের-ঘর বাঁধা। এক ছটাক দুধ পড়তে পায় না। কী দেশের কী অবস্থাই হয়েছে!'

অতঃপর প্রসঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।

দেশের পুরনো দিনের আলোচনা চলে। যে আলোচনায় বর্তমানহীন ভবিষ্যৎহীন হতাশ জীবনের সবচেয়ে আনন্দ।

হৃতসর্বস্ব জাতি অতীত গৌরবের গাথা গায়, অভাবগ্রস্ত মানুষ অতীত সচ্ছলতার গল্পে বিভোর হয়।

'পিতু। পান নিয়ে যা।'

ঘর থেকে মনোরমার ডাক আসে। দু'খিলি পান মেয়ের হাতে দিয়ে মনোরমা চাপা ভৎর্সনার সুরে বলে—'পায়েস টায়েস অত কথা বানাতে কে বলেছে তোমায়?' পিতু অপরাধীভাবে মাথা হেঁট করে।

মা, ঠাকুমা দু'জনকেই বাবার সামনে শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে দেখে ও ভাবে, এ বুঝি ভারি এক মজার খেলা।

মনোরমাও অবশ্য মিথ্যাচারের জন্য মেয়েকে বেশী তিরস্কারের জোর পায় না। তাই ক্ষমার সুরে বলে, 'আচ্ছা যাও, পানটা দাও গে। বেশী আজে-বাজে কথা বোল না। পড়া দেখেশোওগে না একটু। লেখাপড়া শিখতে হবে না? আর এই এক মানুষ! মেয়েটাকে পড়ানো যে একটা কর্তব্য, সে জ্ঞান নেই।'

লেখাপড়া না কচুপোড়া।

লেখাপড়া শিখতে দায় পড়েছে পিতুর। বাবার সঙ্গে কত ভালো ভালো গপ্‌পো হবে এখন, তা নয় লেখাপড়া। ছিঃ।

পঙ্কজের অবশ্য পিতৃকর্তব্য পালনে বিশেষ গা দেখা যায় না। পিতা পুত্রীতে গল্পই চলে।

তা সে গল্পেও শূন্যে স্বর্গ রচনা। বলা যেতে পারে গল্পের শিরোনামা হচ্ছে 'যখন অনেক টাকা হবে।'

লটারিতে টাকা পাওয়াটা নিশ্চিত, তারিখটাই যা এখনো জানা

যাচ্ছে না। সে যাক, টাকাটা কী ভাবে খরচ করা হবে সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। বাপে মেয়েতে সেই কথাই হয়।

জামা কাপড়, খাওয়া দাওয়া, খেলনা পুতুল, ঠাকুরমার ঠাকুর-ঘরের রূপোর সিংহাসন, সোনার 'ঝারা', মনোরমার গাদা গাদা গয়না, পঙ্কজের হাতঘড়ি আর চশমা, এ সমস্ত ব্যাপারেই পিতা কন্যায় একমত। মতের বৈষম্য একটি ব্যাপারে।

পঙ্কজের ইচ্ছে—সকলে মিলে কলকাতায় চলে যাওয়া, পিতুর তাতে দারুণ অনিচ্ছে। এই বাড়ি, এই গ্রাম, লাবি আর অন্যান্য সঙ্গি-সাথীরা, গোঁসাইদের পোড়োবাড়ির ইঁটের স্তূপ সরিয়ে অতি কষ্টে তৈরি খেলাঘর, উঠোনের আমড়াগাছের ডালে বাঁধা দোলনা —এই সমস্ত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না পিতু।

পঙ্কজ অফিসের কথা তুলে কলকাতার স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়; পিতু ভট্চাজ্ জ্যেঠার ছেলের উদাহরণ দেয়। যে ছেলেটি ডাক্তার হয়ে নিত্য দু'বেলা কলকাতায় যাবার জন্য মোটর কিনেছে। যখন অনেক টাকা হবে, তখন গাড়ি কিনতেই বা বাধা কী!

কথার মাঝখানে পিতু ব'লে বসে—'বাবা, তুমি গরীব লোক?'

পঙ্কজ মুহূর্তের জন্য থতমত খায়···পরক্ষণেই হা হা ক'রে হেসে উঠে বলে, 'কে বলেছে এ কথা?'

বাবার হাসিতে পিতু বুকে বল পায়। তাই অগ্রাহ্যের সুরে বলে, 'আবার কে? ওই লাবি!'

'লাবি না হাবি!' পঙ্কজ লাবি সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি ক'রে নিজের বুকের উপর একটা থাবড়া মেরে বলে, 'আমার মতন বড়-লোক এ-গাঁয়ে কেউ নেই বুঝলি? কেউ না।'

এ হেন ঘোষণায় পিতু বেশ একটু অবাক হয়ে বাপের দিকে

তাকায়। কথাটায় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া শক্ত, অথচ বাবার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঘোষণার সপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে। আবার হাসিটাও কেমন যেন রহস্য রহস্য!

সন্দেহমোচনার্থে পিতু বলে,—'তা হলে তোমার জুতো ছেঁড়া কেন?'

'জুতো!'

জুতোর ছেঁড়াটুকু চোখে পড়ে গেছে মেয়েটার! জামা কাপড়ের মত জুতোকে অল্পে ভদ্র চেহারা দেওয়া যায় না।

তবু তো আঁধার ঘেঁষে রোয়াকের নীচে রেখে দিয়েছে জুতোটাকে।

কিন্তু মেয়ের কাছে তো কথায় হারবে না পঙ্কজ, তাই অম্লান-বদনে বলে,—'জুতো ছেঁড়া কেন তাই জিজ্ঞেস করছিস? নতুন জুতো কিনব কখন? দোকানে যাবার সময় আছে? এই তো শনিবার হলেই এখানে? শনি-রবি দুটো দিন গেল। অন্য-দিন আপিস। কখন কিনব? টাকা পকেটে নিয়ে তো ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

শুনে পিতু অবাক।

সময় নেই!

পৃথিবীতে কত সময়! অগাধ অফুরন্ত! দিনের উন্মোচন আর রাত্রির অবতরণে আবর্তিত হ'তে হ'তে চলেছে বিরতিহীন একটানা এক সময়ের স্রোত। অনন্তকালব্যাপী সেই তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দিন আর রাত্রিগুলো! ভট্চাজ্ জ্যাঠা উদয়াস্ত তামাক খাচ্ছেন আর হুঁকো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চৌধুরীদাদু চব্বিশ ঘণ্টা চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে আছেন। লাবুর পিসি একফালি লাউ

কুমড়ো নিয়ে উপহারের ছুতোয় পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোন ছুটোছুটি নেই। সব স্তিমিত। সব নিস্তরঙ্গ।

অথচ বেচারী বাবা!

সময়ের অভাবে টাকা পকেটে নিয়ে ছেঁড়া জুতো প'রে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাকে।

এরা যেন অভিনব এক শব্দগঠনের খেলা শিখেছে। সে খেলায় সবাই মশগুল। প্রথমে কে এই খেলা আবিষ্কার করেছিল সে এখন বলা শক্ত।···পঙ্কজ? মহামায়া, মনোরমা? নাঃ, সে কারো মনে নেই। তবু কেউ ভেস্তে দেবে না খেলা। খেলা ভেস্তে দিলেই হঠাৎ একেবারে গরীব হয়ে যাবে ওরা। সে দারিদ্র্যের উপর তখন আর কোন আব্রু থাকবে না।

তা হ'লে মহামায়ার ভাঁড়ারের হঠাৎ ঘি ফুরিয়ে যাওয়ার রহস্য যাবে ভেঙ্গে! পঙ্কজের 'সময় অভাবের' গল্প ফুরিয়ে যাবে।

তার চেয়ে এই ভালো!···এই মধুর মিথ্যার জাল!

কাজেই পঙ্কজ অনায়াসেই মহোৎসাহে শুরু করে, 'শুধু জুতো? সময়ের অভাবে কত জিনিস হয়ে উঠছে না জানিস? টাক পড়ে যাচ্ছে, একটা ভালো তেল কেনা হচ্ছে না। তোর মা এত সোয়েটার বুনতে জানে, তবু পশম কেনা হচ্ছে না। আর তোর তো কত জিনিসেরই দরকার তার ঠিকই নেই। সে সব কিছু হচ্ছে না ·· শুধু সময়ের অভাবে।'

শিশুর কাছে মিথ্যা ভাষণে পঙ্কজের বিবেক আহত হয় না। 'সময়ের অভাব' এ কথা কি মিথ্যা? সময়ের অভাবেই তো কিছু হচ্ছে না।

তবু 'সময়' একদিন আসবেই, এ পঙ্কজের স্থির বিশ্বাস।

'অসাচ্ছল্য' 'অনটন' এ যেন নেহাতই সাময়িক একটা অবস্থা মাত্র! ও ঠিক হয়ে যাবে। যখন সময় আসবে তখন শুরু হবে সত্যকার জীবন। যে জীবনের প্রতিটি ছবি পঙ্কজের মুখস্থ।

টাকা পকেটে করে বেড়ানো?

সেও মিথ্যা নয়। পকেটটা জামায় নেই, আছে মনে। এই যা।

বাবার কথায় হৃষ্ট পিতু হঠাৎ আপনমনে ভেঙচানির সুরে বলে ওঠে, 'লাবি না হাবি।'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে পঙ্কজ। হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মনোরমা এসে দাঁড়ায়।

রান্না সাঙ্গ হয়েছে, মহামায়া এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যাহ্নিকে বসলেন। এবার মনোরমাও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে স্বামীর কাছে বসতে পারে।

'এত হাসি কিসের শুনি?'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলে, 'যারা বসে না আমরা তাদের কিছু বলি না। এই পিতু খবরদার! বলবি না কেন হাসছিস।'

'এই বসলাম। হ'ল তো?'

পঙ্কজ আরো গম্ভীর মুখে বলে, 'তার আগে বলতে হবে তুমি কেন হাসছ। কেউ তো তোমাকে কোন রহস্য-কাহিনী বলেনি। এসে বসলে, আর হাসতে লাগলে। এর মানে?'

'কোথায় আবার হাসছি? হ্যাঁরে পিতু, হাসছি আমি?' মনোরমা রীতিমত গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে। পিতু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। উজ্জ্বল শিখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটার ঠিক সামনা সামনিই বসেছে মনোরমা, তার ঈষৎ আনতমুখের রেখায় রেখায় আলোর আভা।

কিন্তু এ-আভা কি শুধুই হ্যারিকেনের আলোর? হ্যারিকেনের আলো-লাগা মা'র মুখ তো আরও অনেক সময় দেখেছে পিতু। বাবা যেদিন আসে না সেদিন সন্ধ্যাবেলা বই পড়ার সময়, কিংবা পিতুকে পড়ানোর সময়! সে শুধুই বাইরে থেকে গিয়ে-পড়া আলো, ভিতর থেকে ঠিকরে উঠছে এমন আলো তো নয়। এ যেন অজানিত, এ যেন অলৌকিক।

পঙ্কজ মেয়ের অবাক হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বলে 'শোন, পিতুর হাবি বন্ধু লাবি বলেছে, পিতুর বাবা গরীব। কথাটা হাসির যোগ্য কিনা?'

'তা আবার নয়।' আলোয় ঝলসে ওঠে মনোরমা, 'গরীব কি বল? সম্রাট।'

'এই শুনলি তো পিতু? বলিনি আমি? বলিনি আমার চেয়ে বড়লোক এ-গাঁয়ে আর নেই?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে পিতু। আশ্চর্য! অবাক কথা। বাবার মুখেও সেই একই আলোর উদ্‌ভাসন।

পিতুর মনে হয়, এদের এই সাধারণ কথাগুলো যেন সাধারণ নয়। হাসিটাতো নয়ই। এই কৌতুকভরা মুখের রেখায় রেখায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরো অন্য কিছু—যা পিতুর বুদ্ধির বাইরে।

তবু কী অপূর্ব। কী সুন্দর!....আনন্দে হঠাৎ চোখে জল এসে যায় পিতুর।

এখন যদি লাবিকে ডেকে এনে দেখাতে পারত! এখন দেখলে পিতুর মা'র গায়ে গয়না নেই বলে ঠাট্টা করবার সাধ্য হ'ত লাবির? গয়না আছে কি না, মনে প'ড়ত?

অর্ধেকটা জীবন যুদ্ধ করিয়াই কাটিল।

মনের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে, সংসারের পাঁচজনের সঙ্গে।

এতদিনে ছুটি মিলিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ মিলিয়াছে এতদিনে। ভাসুর দেওর জা ননদ আর শাশুড়ীর আওতা ছাড়াইয়া এতদিনে মাথা তুলিয়া আকাশের আলো দেখিবে কল্যাণী। প্রাণ ভরিয়া পান করিবে পৃথিবীর বাতাস।···মুক্ত সতেজ, জীবনের রসে ভরপুর।

কল্যাণী পৃথক হইবে।

শৈশব কাটিয়াছে মাত্র, কৈশোর উঁকি দিয়াছে কি দেয় নাই—সেই বয়সে কল্যাণী আসিয়া ঢুকিয়াছে আলো-বাতাসহীন বুকচাপা এই খাঁচাখানার ভিতর। জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে সংসারের এই বৃহৎ চাকাখানার একাংশে। তাহার পর চলিতেছে—দিনের পর দিন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

ইহারই মধ্যে কখন যে কৈশোর আসিল গেল—যৌবন আসিতে চাহিয়া ফিরিয়া গেল, কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে? এখন তেত্রিশ বৎসর বয়সে পাঁচটি সন্তানের জননী, কল্যাণী চায় একটু হাত-পা মেলিয়া বাঁচিতে। চায় নিজের একটি সংসার। অখণ্ড স্বাধীনতায় কর্ত্রীত্বের সুখ।

যেখানে সকালবেলা উঠিয়া বোকার মত প্রশ্ন করিতে হইবে না—'আজ কি ডাল রান্না হবে ঠাকুরঝি?' চাকরকে বাজারে

পাঠাইতে গিয়া খুকীর মত শুধাইতে হইবে না—'মা বলে দিন্ না, কি মাছ আসবে, কি তরকারি ?'

বাপ ভাই বেড়াইতে আসিলে সংসারের কাজ কামাই দিয়া দুই দণ্ড বসিয়া গল্প করিয়া আসিয়া কাহারও ভারীমুখ দেখিতে হইবে না—হইবে না অপরাধীর মত 'ভারীমুখের' তোষামোদ করিতে।

যেখানে বন্ধু-বান্ধবকে একপেয়ালা চা দিয়া অভ্যর্থনা করিতে গেলে সংসারের পাঁচজনের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে না। আপনার সংসারে নিজের গৃহস্থালিতে কল্যাণী সাহস করিয়া যাহাকে ইচ্ছা বলিতে পারিবে—'বসিয়া যাও, খাইয়া যাও।'

আদরের সন্তান কয়টিকে ইচ্ছামত খাওয়াইতে পরাইতে, আবদার মিটাইতে পারিবে। অপরের মুখ চাহিয়া মনের সাধ মনে চাপিয়া অবহেলার ভঙ্গীতে মানুষ করিতে হইবে না। পাঁচজনের সংসারে ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা—যেন একটা হাসি-তামাসার বিষয়। শিশুসন্তানকে উচিতমত যত্ন আদর করা অপরাধ।

স্বামী-সেবা ? সে তো বেহায়াপনার নামান্তর মাত্র !

'সংসার' নামক দৈত্যটার যেন হৃদয় নাই, মস্তিষ্ক নাই, বুদ্ধিবৃত্তি স্নেহ-মমতার বালাই নাই, আছে শুধু উদর আর ক্ষুধা। সেই বিরাট ক্ষুধাগ্নিতে সর্বস্ব আহুতি দিলেও তাহার আশা মিটিতে চায় না।

কিন্তু এতদিনে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল কল্যাণী। অনেকের ঈর্ষার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে সে। আজ পর্যন্ত যে যতটা হুল্ ফুটাইতে পারে ফুটাইয়া লইতেছে, কিন্তু কল্যাণীর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

কাল হইতে তো সবের শেষ হইবে। এই আড়ালে-আব্‌ডালে ফিস্‌ফাস্, পিছনে দাঁড়াইয়া 'ঠেস দিয়া' কথা, মুখোমুখি কলহ আর কচকচি।

কাল তাহাদের যাত্রার দিন—পঞ্জিকা খবর দিয়াছে শুভ-লগ্নের।

স্বামী জানাইয়াছেন, বাড়ি ভাড়া অগ্রিম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। নাঃ, সন্দেহের আর কিছু থাকিতে পারে না। পুলকের অদ্ভুত অনুভূতিতে সারারাত্রি ঘুম নাই কল্যাণীর।....তাহার এই তেত্রিশ বছরের জীবনে—এমন রোমাঞ্চকর উত্তেজনাময় রাত্রি কি আর কখনো আসিয়াছে?

যতীশ্বর ঘুমাইতেছে—গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মৃদু নাসিকা-ধ্বনি—মাঝে মাঝে আশ্চর্য করিয়া তুলিতেছিল কল্যাণীকে। আজি-কার রাত্রে—প্রত্যহের মতই নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছে যতীশ্বর!

যেন আগামী প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই—বিশ বৎসরের আকাঙ্ক্ষার সাফল্য। নাই—বিশ বৎসরের অতৃপ্তি অধৈর্য ব্যর্থতা উপায়হীনতার মধুর পরিসমাপ্তি।

কিন্তু—সুপ্ত যতীশ্বরের মুখের ভাবটা কেমন ক্লিষ্ট-করুণ দেখাইতেছে না?...শ্রমের ক্লান্তি? না আর কিছু? কল্যাণীর অদম্য উৎসাহের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না কেন যতীশ্বর? এমন 'মিয়াইয়া' পড়ে কেন?

অথচ যতীশ্বরই কি অতিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই? মেয়েমানুষ কাঁদে-কাটে, রাগ-ঝাল করে, স্বামীর উপর তর্জন গর্জন ক'রে ছেলে ঠেঙায়—তবু যাহাদের জন্য এত যন্ত্রণা আবার তাহাদেরই সঙ্গে

হাসিয়া কথা কয়। কিন্তু পুরুষ মানুষ যখন বিরক্ত হয় তখনি অন্তর হইতে বন্ধন কাটিয়া যায়।

পৃথক হইবার প্রস্তাব যতীশ্বরই প্রথমে করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কল্যাণী যখন আশার স্বপ্নে বিভোর হইয়া সম্মুখের দিনগুলা হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে চায়, উৎসাহে অধীর হইয়া ওঠে, তখন যেন আর যতীশ্বরের নাগাল পাওয়া যায় না।

বাড়ি ভাড়া করা, নূতন সংসারে পাতাইবার অজস্র খুঁটিনাটি ব্যবস্থা, সবই করিতেছে বটে—কিন্তু আপনার উৎসাহে নয়, কল্যাণীর ঠেলায়। কল্যাণী আপনার উৎসাহ সঞ্চারিত করিতে চায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

বলে, 'বুঝলি নন্তু—দোতালার বারান্দার পাশে সেই ছোট্ট ঘরখানা? ওইটে মন্তুর আর তোর পড়ার ঘর করে দেব। আলাদা একখানা পড়ার ঘর, কেউ জ্বালাতন করবে না। ছোট্ট একটা টেবিল থাকবে—দু'খানা বেতের চেয়ার কিনে দেব দুই ভাইকে। আর পুতুলের ওই আলমারীটা—কিই বা আছে ওতে? গোটা কতক বাজে পুতুল—খালি ক'রে দিয়ে দেব তোদের বই রাখতে। তোদের জামা জুতো সব থাকবে গোছানো তোদের ঘরে। একপাটি জুতো পরে' আর একপাটির জন্যে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াতে হবে না। ছোট খুড়ির ছেলেরা বইখাতা ছিঁড়ে অস্থির করে দেবে না—ভাতের জন্যে ইস্কুলের বেলা হয়ে যাবে না। ভোর বেলা উঠে রান্না চড়িয়ে দেব...কতটুকুই বা রান্না? তখুনিই তো হয়ে যাবে, কি বলিস?....আর ইস্কুল থেকে যখন আসবি, তখন গরম খাবার ক'রে দেব—যেদিন যা ইচ্ছে। বেশ হবে কেমন?'

'নন্তু' 'মন্তু' পরমোল্লাসে সায় দেয়।

বৈচিত্র্যের আস্বাদ জীবনে পায় নাই উহারা।

মেয়েদের সঙ্গে চলে—আরো গভীর পরামর্শ। বড় মেয়ে শেফালী বেশ বড়ই হইয়াছে, বিবাহ দিলেও চলে কিন্তু বড় ও মেজ জায়ের তিন চারিটি মেয়ে বাইশ চব্বিশ বছরের হইয়া বসিয়া আছে —বিবাহ হয় নাই। কাজেই নিজের পনের ষোলো বছরের মেয়ের বিবাহের চেষ্টা করিতে চক্ষু-লজ্জায় বাধে। অথচ কল্যাণীর মেয়েরা দেখিতে ভালো। চেষ্টা করিলে হইয়া যায়।

—'দেখ্ শেফা, তোকে এবার ম্যাট্রিক দেওয়াবো আমি। প্রাইভেটে পড়ে পারবি না পাশ করতে?'

—'কেন পারবো না? দিতামই তো এবছর'—শেফালী উত্তর করে—'ঠাকুমার যেমন সেকেলেপনা "বড় হয়েছে ইস্কুল ছাড়িয়ে নাও" বলে আমার পড়াটাই ঘুচিয়ে দিলেন। দীপুকে কিন্তু যেন ছাড়িয়ে নিও না মা।'

'পাগল! আর নিই? দীপু এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠবে বুঝি?'

—'ক্লাস 'নাইনে'।'

—'ওই হ'ল—আমাদের ওই সোজাসুজি থার্ড ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসই মাথায় ঢোকে। হ্যাঁরে তোদের সেই 'বাসন্তী দিদিমণি' তো গান টান শিখিয়ে বেড়ান—গোটা পাঁচ সাত টাকা দিলে রাজী হবেন না—তোদের দুই বোনকে একটু গান শেখাতে?'

—'গোটা পাঁচ সাত?' শেফালী হাসিয়া ফেলে—'একজনকেই দশ টাকার কম নয়।'

—'দশ?' কল্যাণী একটু ভাবিয়া লয়, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে— 'তা একটু টেনেটুনে চালিয়ে গোটা দশেক টাকা আমি বার ক'রে

দেব। আমার চিরদিনের সাধ, নিজের তো কখনো কিছু হ'ল না। তোর ঠাকুমা যে বলেন—"ধান হলাম না আগরা হলাম—কুলোর আগায় নেচে মলাম"—আমারও হয়েছে সেই দশা। তবু তোদেরও যদি কিছু হয়। ওই তোকে শেখানোর ছুতো ক'রে রাখবো—দীপুটা কাছে বসে থেকে শিখে নেবে।'

শেফালীও ভাবী সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া ওঠে। চব্বিশ ঘণ্টা—বাহান্ন জন লোকের বাহান্ন রকম ফরমাস নাই—পাঁচ সাতটা কচি ছেলের কান্না থামানো, দুরন্তপনা সামালানোর দায়িত্ব নাই—ঠাকুমা পিসিমার অযথা তিরস্কার, জ্যেঠি খুড়ির 'চিপটেন কাটা' কথা কিছুই শুনিতে হইবে না। বাড়িটা তাহারা দেখিয়া আসিয়াছে—দোতলার উপরই সব ব্যবস্থা, নিচে নামিতেই হয় না। রান্নাঘরের সামনে সেই খোলা বারান্দাটিতে পড়িতে বসিবে তাহারা—গান শিখিবে দিদিমণির কাছে। সময় সময় মা'র কাজের সাহায্য করিবে।···খোকনটার জন্য একটা দোলা টাঙাইয়া দিলেই চলিবে—দুরন্ত হয় নাই এখনো।···রোমাঞ্চ তাহাদেরও হয় কল্যাণীর মত!

—'কিন্তু মা, হারমোনিয়ম তো চাই একটা? যা দাম হয়েছে আজকাল—'

—কেন এ বাড়িরটাই নিয়ে যাবো। উনি তো কিনেছিলেন ওটা।'

—'মেজদা যে বাজায়?'

—'তা বললে কি হবে?' একগুঁয়ের মত উত্তর করে কল্যাণী—'চিরকাল ভালোমানুষি ক'রে এলাম—লাভ হল কী? নিন্দে অপযশ ছাড়া গুণ গাইল না কেউ কোনদিন,···তবে?'

'তবে'র উত্তর শেফালীর কাছে নাই। কিন্তু মেজদার ব্যবহারের

জিনিসটা—একদা বাবা কিনিয়াছিলেন বলিয়া কাড়িয়া লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে মায়ের সঙ্গে সে একমত হইতে পারে না। সঙ্কোচে নীরব হইয়া যায়।

কল্যাণী বোধ হয় মেয়ের নীরবতার অর্থ বোঝে, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে—'তা না হয় হারমোনিয়ম নাই হোল—এস্রাজের বাজনা বেশ লাগে আমার। আমার নিজের টাকা দিয়ে তাই একটা কিনে দেব তোদের—কি বলিস?'

আর বলিবার কিছু নাই শেফালীর। পাশের বাড়ির সুনন্দার মত মাকে জড়াইয়া আদব করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তেমন অভ্যাস তাহাদের নাই বলিয়াই লজ্জায় পারে না। দীপালী স্কুল হইতে ফিরিলে কতক্ষণে এই শুভ সংবাদটা তাহার কর্ণগোচর করিবে তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

আর তাহারা ময়লা মোটা শাড়ি পরিয়া বেড়াইবে না—সুনন্দাদের মত রঙিন শাড়ি ব্লাউস পরিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। বড় সংসারে ছোট মেয়েরা অল্প বয়সে পাকিয়া যায়, এটা মিথ্যা নয়। শেফালী জানে, যতীশ্বরই উপার্জন করে সকলের চাইতে বেশী। জানে সে উপার্জনের অংশ অনেকের ভাগে পড়ে বলিয়াই তাহাদের ভাগে কম পড়িয়া যায়। কিন্তু আলাদা বাড়িতে গিয়া সবটাই ভোগ করিতে পারিবে তাহারা।

সুনন্দা অপর্ণাদের মত অতটা 'স্টাইলে' না হোক, সভ্য সুন্দর মার্জিতভাবে থাকিতে পারে তা'রা—যতীশ্বরের বর্তমান আয়েই পারে। তবু তো আগামী মাস হইতে একটা 'টিউশনি' লইবে যতীশ্বর, আরো ত্রিশ টাকা আয় বাড়িয়া যাইবে।

আশ্বিন মাস পড়িলে যাইবার কথা, ভাদ্রের এই শেষের দিন ক'টা কাটিতেই চায় না।

তবু, শেফালী দীপালী নন্তু মন্তুও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আজিকার এই পুলকচঞ্চল আগ্রহ-উদ্বেল রাত্রে।

শুধু ঘুম নাই কল্যাণীর।

বাড়ি বদল করিবার জন্য দুই দিন ছুটি লইয়াছে যতীশ্বর।

একবার পাশ ফিরিয়া একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে কল্যাণী। কাল আর অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া পুরানো ঘানিতে জুড়িতে হইবে না নিজেকে। ভোরবেলায় গিয়া ঢুকিতে হইবে না ঝুল-কালিভরা জানালাহীন রান্নাঘরখানায়। রাক্ষসের মত জ্বলন্ত দুইটা উনানে চাপাইতে হইবে না প্রকাণ্ড হাঁড়ি দুইখানা।

ভাসুর দেওর সকলেরই অবশ্য অফিস কাছারি আছে, কিন্তু কল্যাণীর আর দায় নাই। সকালের দিকেই রওনা হইবে তাহারা। নূতন বাসায় রাঁধিয়া খাইবে।

ভোরবেলাতেই ছেলেমেয়েরা উঠিয়া পড়িয়াছে, শুধু যতীশ্বরই অঘোরে ঘুমাইতেছে। মেয়েদের জল্পনা কল্পনা—কে কি শাড়ি, ব্লাউস পরিয়া যাইবে। খালি বাসা, নিজেরাই যাইবে বটে তবু নিচের তলায় বাড়িওয়ালারাও তো আছে? সামনের আর পাশের বাড়িতে আছে কৌতূহলী দৃষ্টি। নন্তু মন্তুর দুশ্চিন্তা কি উপায়ে তাহাদের ভাঙা লাটাই আর আল্‌ভাঙা লাট্টু কয়টা মা-বাবার চোখ এড়াইয়া লইয়া যাওয়া যায়। দেখিলেই তো এখনি 'জঞ্জাল' বলিয়া ফেলিয়া দিবেন। অথচ জিনিসগুলা যে কত দরকারী—

হঠাৎ নন্তু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ মা, আমরা নাকি আর কক্‌খনো এ বাড়িতে আসব না ?'

—'বালাই-ষাট্'—কল্যাণী ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলে—'কেন আসবে না ? কে বলেছে এ কথা ?'

—'বাদ্‌লাটা বলছে, বলে কিনা—"ইস্ আসবি বইকি এ বাড়িতে ? ঠ্যাং ভেঙে দেব না তা'হলে....আলাদা হয়ে যাচ্ছিস্ আবার আসতে দিলে"—হ্যাঁ মা সত্যি ? ঠাকুমাকে পিসিমাকে আর কাকামণিকে জ্যেঠাবাবুকে, বড়দি, ছোড়দিকে, বেলা, বাচ্চু ভোম্বোল—কাউকে কোনদিন দেখতে পাব না আর ?'

কল্যাণী গম্ভীরভাবে বলেন—'ছিঃ নন্তু, শুনো না বাদলের কথা। তোমরাও বেড়াতে আসবে, ওরাও বেড়াতে যাবে, আমরা তো আর ঝগড়া ক'রে যাচ্ছি না—ঘরে কুলোয় না ব'লে—'

কথার শেষার্ধে কর্ণপাত না করিয়া নন্তু বলে—'কি ওরা যাবে বেড়াতে ? হুঁঃ। পিসিমা বলেছে—"তোদের বাড়িতে কেউ থুতু ফেলতেও যাবে না।" কিইবা লাভ হ'ল তা'হলে নতুন বাড়িতে গিয়ে ? কাউকে যদি দেখতেই পাবো না—'

নিদ্রিত যতীশ্বরকে আর নিদ্রিত মনে হয় না, কল্যাণী একবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চ কঠিনকণ্ঠে বলে—'যাও কে কি বাজে বাজে কথা বলছে শুনতে হবে না—মুখহাত ধুয়ে জামা জুতো পরে ঠিক হয়ে নাও। মন্তুকে বলো মুখ ধুতে।'

নন্তু বাহির হইয়া গেলে কল্যাণী স্বামীর গায়ের উপর একখানা হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলে—'আর কত ঘুমোবে ? ওঠো এবার—পুরুত মশাই বলেছেন আটটার মধ্যে যাত্রা করতে—মাহেন্দ্রযোগ আছে।'

যতীশ্বর চোখ না মেলিয়াই পাশ ফিরিয়া বলে—'আমার বোধ হয় জ্বর হবে—মাথা ছিঁড়ে পড়ছে।'

সারারাত্রি নিষ্কণ্টক নিদ্রার পর যদি সকালে উঠিয়া কেহ বলে—মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, উৎকণ্ঠা খুব বেশী আসে না, বিশ্বাস করিতেও—কিন্তু সে কথা যাক্।

কল্যাণী সহজভাবে বলে—'সর্দি টর্দি হয়েছে বোধ হয়, সারারাত মাথার শিওরের জানালা খোলা ছিল—কই, গা তো বেশ ঠাণ্ডা!'

যতীশ্বর সহসা কল্যাণীর হাতটা ছুঁড়িয়া দিয়া উদ্ধত স্বরে বলে—'বলিনি তো যে একশো পাঁচ জ্বর হয়েছে আমার, খাট আনতে পাঠাও—শরীর খারাপ লাগছে, মাথা ধরেছে, উঠতে পাচ্ছি না।··· যাও না, তোমরা ঠিক হওগে না।'

কল্যাণীর চোখে জল আসিয়া পড়ে· অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলে—'তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা আবার কি ঠিক হবো শুনি?'

—'কেন, ছেলে মেয়ে মা সকলেই তো বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। ভাবনা কি? মোট বইবার সময় ঠিক হাজির হবো আমি, ভয় নেই। সাড়ে ছ'টা তো বেজেছে সবে। কুড়ি বছর কাটাতে পারলে আর কুড়িটা মিনিট সবুর সইছে না?'

কল্যাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া জানালার ধাপের উপর বসে। সামনে মিত্তিরদের শ্যাওলাপড়া দেওয়ালটায় সকালের রোদ বাঁকা হইয়া পড়িয়াছে···টিলের ছাদের ঘরটার একটা জানালার কপাট নাই···বিশ বৎসর ধরিয়া এই একই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে কল্যাণী···তেরো বছর বয়সে এই ঘরে বধূ হইয়া আসিয়া ঢুকিয়াছিল—এখন এই তেত্রিশ বছর বয়স। আশ্চর্য জানালার কপাটটা, উহারা সরায় না কেন? হয়তো নিজেদের বাড়ি বলিয়া—ভাড়াটে

বাড়ি হইলে বাড়িওয়ালার ঘাড় ভাঙিয়া করাইয়া লইত অনেকদিন আগে।

কল্যাণীদের এই বাড়িটা কুড়ি বৎসরের ভিতর একবার কলি ফিরাইতে দেখিল না কল্যাণী। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, কত কি ঘটিয়া গেল ইহার উপর দিয়া—ঘরের সাদা দেওয়ালগুলা হল্‌দে হইয়া গিয়াছে, ধূলায় আর তেলে হইয়াছে পালিশ করা। রান্নাঘরে একটা জানালা ফুটাইবার কথা শুনিয়া আসিতেছে আসিয়া পর্যন্ত।

দীপালী আসিয়া বলে—'মা আমার সেই সবুজ ভয়েলের ব্লাউসটা বড় ট্রাঙ্কে তুলে ফেলেছ নাকি?'

কল্যাণী ক্লিষ্ট সুরে বলে—'কি জানি, মনে নেই—দেখ খুঁজে।'

হঠাৎ যতীশ্বর উঠিয়া বসিয়া বলে—'কি এমন কুটুম্বুর বাড়ি নেমন্তন্ন যাওয়া হবে তাই ঢাকাই বেনারসীর খোঁজ হচ্ছে? যা প'রে আছিস তাই প'রেই যাবি।'

দীপালী কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া যায়—যতীশ্বর পাশের খালি ছোট্ট বিছানাটার পানে চাহিয়া বলে—'এই, খোকন কোথায়?'

—'খোকন?' দীপালী কি বলিতে গিয়া একবার ঢোক গিলিল। দরজার ওদিকে দাঁড়াইয়াছিল ছোটবাবুর মেয়ে রূপালী। সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া কহিল—'ঠাকুমা তো তাকে কোলে নিয়ে সকাল থেকে কাঁদছেন।'

—'কাঁদছেন?' বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে যতীশ্বর।

—'মন কেমন করছে তাই কাঁদছেন। সকলে তো আপনাদের মতন নয়।'

বলিয়া দশম বর্ষীয়া রূপালী যতীশ্বরকে হতচকিত করিয়া তর্‌

তর্ করিয়া চলিয়া যায়। দীপালীও এই বিপরীত অবস্থার মাঝখান হইতে খসিয়া পড়ে।

যতীশ্বর কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া বাতায়নবর্তিনী বিমনা কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলে—'তোমার কি মনে হয় মা'র চোখের জল ফেলিয়ে গিয়ে আমাদের ভালো হবে?

কল্যাণী একবার মুখটা ফিরাইয়া আবার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে—কথার উত্তর দেয় না।

যতীশ্বর ঈষৎ নরমভাবে বলে···'মা আর ক'দিন? তাই ভাবছি—গুরুজনের মনে কষ্ট দিয়ে—'

কল্যাণীর মুখের আগায় আসিয়া পড়ে, তোমায় মায়ের 'দিন' আমার 'দিনে'র চাইতে বেশী হওয়াও অসম্ভব নয়। 'দিন' কাহারও গোণা থাকে না। কিন্তু কিছুই বলে না—'কাঠ' হইয়া বসিয়া থাকে।

যতীশ্বর জানে না—কল্যাণী জানে, যে-ছেলেকে কোলে লইয়া স্নেহময়ী পিতামহী কাঁদিতে বসিয়াছেন—থাকিয়া গেলে ওই ছেলেরই কান্না আবদারে বিরক্ত হইয়া ওই স্নেহময়ীর মুখ হইতে বাহির হইবে—'যত রাজ্যের অকালের মড়াগুলো মরতে এসেছে আমার বাড়িতে—যমেও তো ছোঁয় না আপদদের।'

তাই যতীশ্বর মাথাটা টিপিয়া টিপিয়া কল্পিত মাথাধরাকে প্রায় সত্যে পরিণত করিয়া এক সময় বলিয়া ওঠে—'ও বাড়ির ভাড়ার আগাম টাকা ক'টা জলেই গেল। ছেলেমেয়েগুলোরও সঙ্গীছাড়া হয়ে মন টেঁকবে না।···কি ব'লো তুমি?'

কল্যাণী কিছুই বলে না—গামছাখানা হাতে লইয়া চান করিতে নামিয়া যায়।

ছোটজা বড় গামলাখানা কলের মুখে বাগাইয়া ধরিয়া এক গামলা চাল ধুইতেছিল....কল্যাণীকে দেখিয়া মুখখানা টিপিয়া কহিল—'মা তো আজ ঘর থেকে বেরোতেই পাচ্ছেন না—আপনাকে বলতে বলে দিলেন ঠিক সময়ে যাত্রার আয়োজন করে নেবেন।'

কল্যাণী সেল্‌ফ হইতে নারিকেল তেলের বাটিটা মাথায় মাখিতে মাখিতে সহজ স্বরে বলে—'আজ আর যাওয়া হবে না ছোট বৌ, তোমার ভাসুরের জ্বর এসেছে....তুটো উনানই ধরে গেছে নাকি ?...আচ্ছা ভাতটা চড়াও, আসছি আমি।'

শেষ

